মে ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ভূমিকম্প কি ও কেন লিখেছেন : দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

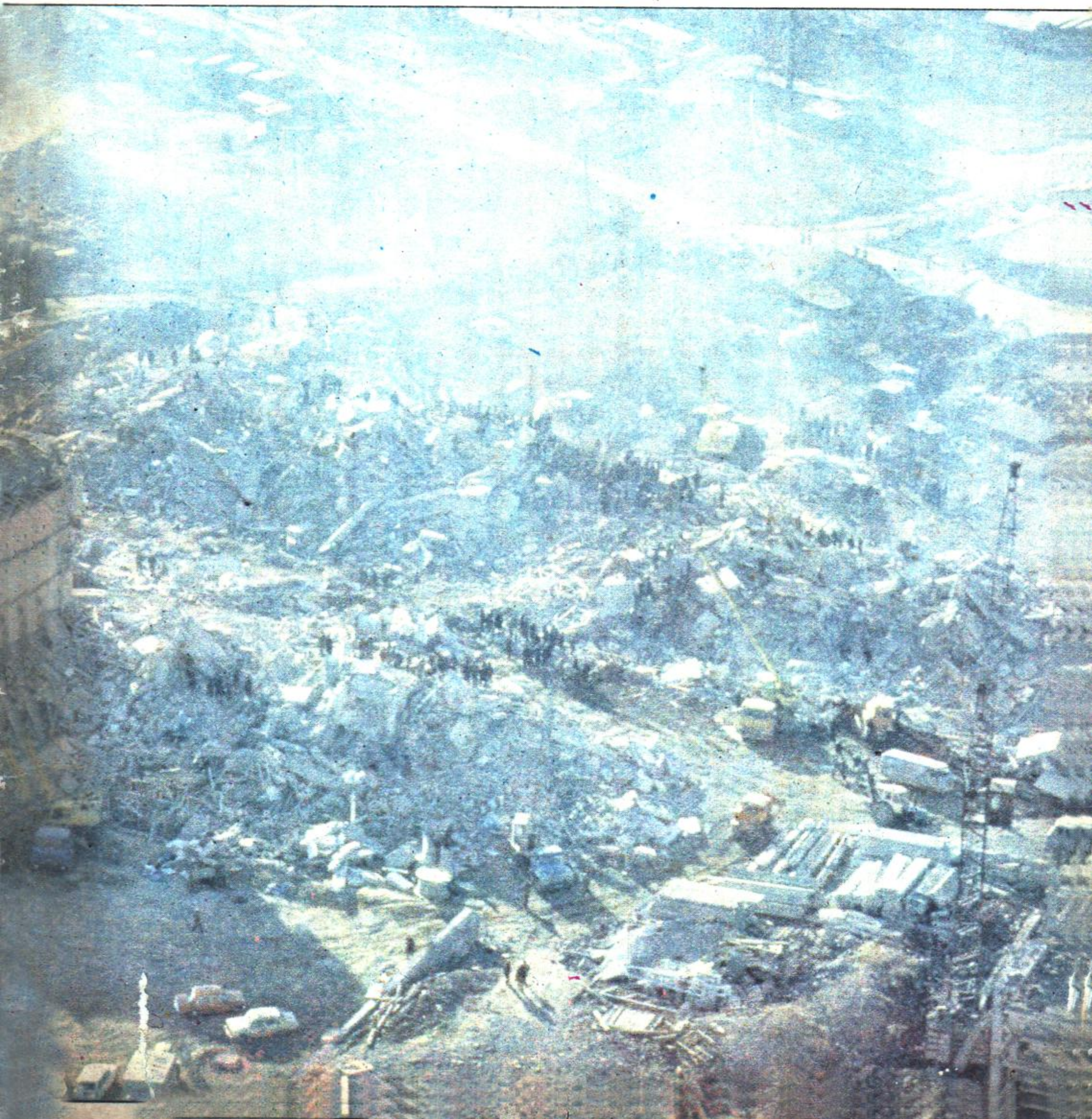

ছোটদের জন্য অভিনব সাধারণ জ্ঞানের বই

দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

যে বই ছেলেমেয়েদের ক্লাসের
পড়াতেও সাহায্য করবে

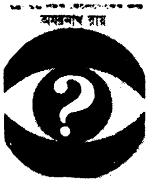

স্টুডেন্ট নলেজ গাইড

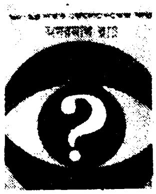

১ম : ১০ থেকে ১৪ বছরের জন্য ॥ VI-VIII
২য় : ১৪ থেকে ১৬ বছরের জন্য ॥ IX-X
প্রতি খণ্ড ১২ টাকা ॥ V. P. P. ১৫ টাকা

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

বাঙলার গাছপালা

মূল্য : দশ টাকা

৩০টি আলোকচিত্র

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫

১৯০১ সাল। পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেলেন এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক ভিলম হেলম কমরাড রয়েন্টগেন। সেই থেকে শুরু। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে আসছেন বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু তাঁদের অবদান ও আবিষ্কারের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি ? জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক সমরজিৎ কর তাঁর স্বাদু কলমে পরিবেশন করেছেন সেইসব রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য যা গল্প উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর

বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অগ্রপথিক

সমরজিৎ করের **নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী**

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ২০

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ১৫

খেলার নির্দেশসহ একটি বই
আস্ত বই ও দশরকম খেলার
সরঞ্জাম সহ **সিদ্ধার্থ ঘোষের**
আশ্চর্য বইয়ের বাক্স।

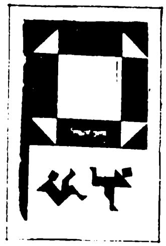

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন **লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

নবম বর্ষ 2য় সংখ্যা
মে 1989

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : মহাকাশের সেই বিচিত্র বস্তু ॥ সমরজিৎ কর 7
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ভূমিকম্প কি ও কেন ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 19 ভূমিকম্পের ভয়াবহতা ॥ শুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য 20 : ভূমিকম্প রোধ করা যায় কি ভাবে ॥ জহর মুখোপাধ্যায় 22
পড়াশোনা : মজার সংখ্যা ॥ মিঠু মাইতি 15 : মজার অঙ্ক ॥ কাজল ভট্টাচার্য 16 : পৃথিবীকে তুলে ধরা কি সম্ভব ॥ সমীর কুমার ঘোষ 17 : আঁকার অঙ্ক লিখে ॥ অরুণ সাহা 54
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : হ্যালোবিয়া ॥ মহঃ মাসউদ আলম 35 : পাখিদের জন্য ॥ আইজ্যাক অ্যাসিমভ (অনুবাদ নিরঞ্জন সিংহ) 47
শরীর-স্বাস্থ্য : রাজরোগ যক্ষা ॥ আশিস মান্না 29
গাছপালা : কুইনাইন ॥ নুরুর রহমান জাহাঙ্গীর 27
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : লেসার রশ্মি ॥ কৌশিক ভট্টাচার্য 18 : বিজ্ঞানের টুকিটাকি ॥ বরুণ মণ্ডল 42 : বিজ্ঞান সংবাদ 10
নিজে নিজে কর : মডেল এর রকমফের ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 52 মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 53 : ট্রানজিস্টার এর ক্রিয়া পদ্ধতি ॥ অনিরুদ্ধ সরকার 65 : কম খরচে স্টিরিও অ্যামপ্লিফায়ার ॥ শুভাশিস বিশ্বাস 59
পৃথিবী ও সম্পদ : আসল কিম্বা নকল ॥ সুনীত রায় 40
বিতর্ক : বিশেষ ত্রিভুজের এক নতুন ধর্ম ॥ আব্দুল হালিম সেখ 9
ফিচার ও ছবিতে গল্প : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : যুগের ভিতর যুগ ॥ অনিল কর্মকার ও গৌতম কর্মকার 43 : আবিষ্কারের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল 11 : আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ অনিল কর্মকার ও গৌতম কর্মকার 12 সাদা চাপা ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55 : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 58
প্রতিযোগিতা : ক্যুইজ কনটেস্ট 56 : শব্দকুট ॥ শাশ্বতী কুণ্ডু 57 : আই কিউ টেস্ট 57
ধারাবাহিক উপন্যাস : বোর্ণিওর বেরী ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 31
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : পরিষদের খবর 63 : সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 : বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 60

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আমরা ও পরিবেশ

লিখবেন

তারকমোহন দাস, সমরজিৎ কর, সুধাংশু পাত্র, এণাক্ষী বিশ্বাস, কিন্নর রায় ও অনেকে

প্রধান সম্পাদক : **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক : **রবীন বল**
সহ সম্পাদক : **জয়ন্ত দত্ত**

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং পি-21 চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস কলকাতা-6 থেকে মুদ্রিত।
দাম : 5·00 টাকা

চিঠিপত্র

'অক্টো-নভেম্বর '88 সংখ্যার কিছু ভুল চোখে পড়ল। 8 নং পৃষ্ঠায় জীবাণু ও ভাইরাস সম্পর্কে ওমর আহমেদের চিঠি পড়লাম। তিনি ভাইরাসের আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম প্রকাশ করেন। কিন্তু তার মধ্যে শুধুমাত্র রুশ বিজ্ঞানী ইভানোস্কি 1892 খ্রীস্টাব্দে ভাইরাস আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে 1896 সালে ডাচ-বিজ্ঞানী ম্যারিটিনাস উইলেম্ বিজেরিংক, 'ভাইরাস' নামকরণ করেন।

ঐ চিঠিতেই জোনাকির দেহের আলোর উৎস সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে আসল অংশকেই বাদ দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে জোনাকির আলো উৎপাদনকারী অংশটি ওর তলপেটে থাকে। স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা এ অংশটি নিয়ন্ত্রিত হয়। অংশটিতে দুটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। একটি 'লুসিফেরিন' অন্যটি 'লুসিফেরাস'। বাতাসের অক্সিজেনের সাথে 'লুসিফেরিন' যুক্ত হয়ে আলো উৎপন্ন করে। লুসিফেরাস এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। এই বিচ্ছুরিত আলোয় কোনও তাপ থাকে না। আলো উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে 'প্রাণী-দীপ্তি' বলে। (Bioluminescence)।

পড়াশোনা

'পড়াশোনা' বিভাগে সমীর কুমার ঘোষ তাঁর 'উষ্ণতা ও তার পরিমাপ' প্রসঙ্গে থার্মোমিটারে উষ্ণতার পাল্লা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পারদ ও অক্সিজেন বাষ্প দিয়ে তৈরী থার্মোমিটার নিম্নস্থিরাংক থেকে উর্ধ্ব স্থিরাংক পর্যন্ত উষ্ণতা যথাক্রমে (39°C to 300°C) ও (– 150°C to 210°C) বলেন। কিন্তু ওগুলি হবে যথাক্রমে (-39°C to 357°C) ও (-150°C to 210°C)।

শেষ প্রসঙ্গে আসা যাক। 'পড়াশোনা' বিভাগে দেবাশীষ গোস্বামীর 'বৃত্ত—একটি নতুন ধর্ম' পড়লাম। কিছু ভুল চোখে পড়ল।

তিনি প্রথম সূত্র হিসাবে বলেন, "যদি R এবং C যথাক্রমে কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও কোন একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্যকে সূচিত করে এবং যদি A দ্বারা ঐ জ্যা দ্বারা ছিন্ন উপচাপ কর্তৃক উৎপন্ন পরিধিস্থ কোণের মান বোঝানো হয়, তবে A ধ্রুবক হলে, $R \propto C$."

এইরকম ধর্ম যে বহু পূর্বেই উদ্ভাবিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক।

পৃথিবী একটি অভিগত গোলক। এর ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল মোটামুটি 19 কোটি 70 লক্ষ বর্গ মাইল। এই পৃথিবীর মধ্যে কলকাতা থেকে দিল্লী ও বোম্বাইয়ের রৈখিক দূরত্ব আনুমানিক 1287 ও 1539 কিলোমিটার। এবং কলকাতাকে কৌণিক বিন্দু ধরলে দিল্লী ও বোম্বাই পরস্পর 44·9° কোণ করে অবস্থিত। একটি ছোট ভূ-গোলক-এ এই দূরত্ব পরস্পর 44·9° কোণ করেই দেখানো হয়েছে 71·5 ও 85·5 m.m. একটি ছোট গোলকে কখনই দূরত্ব 1287 ও 1539 km. দেখানো সম্ভব নয়। বা একটা 1287 কিমি. অপরটা 85·5 m.m. দেখানো সম্ভব নয়, কোণের মান অপরিবর্তিত রেখে।

$\therefore$ $\angle A$ অর্থাৎ 44·9° কোণটি ধ্রুবক হলে—

সর্বদাই, $$\frac{1287}{1539} = \frac{71 \cdot 5}{85 \cdot 5}$$

অক্টো-নভেঃ'88 সংখ্যায় প্রকাশিত 'আত্মা, জন্মান্তর, পরলোক' শীর্ষক চিঠির বক্তব্য—প্রতিষ্ঠিত কাহিনীকারদের বিভিন্ন কল্পবিজ্ঞান কাহিনী যখন পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তখন আত্মা জন্মান্তর পরলোকও একদিন সত্যবলে প্রমাণিত হবে। পত্রপত্রলেখকের কথায় '...আত্মা জন্মান্তর প্রভৃতি নিয়ে স্বদেশে কি বিদেশে তেমন ব্যাপক ভাবে চর্চা আজো শুরু হয় নি' কিন্তু তিনি স্থিরনিশ্চিত পরলোক এবং আত্মার রহস্য '...মানুষই আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে' কারণ 'মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।'

বিজ্ঞানের সত্য খুঁজতে গিয়ে উপমা অচল ভের্ণ এর নটিলাস থেকে হয়তো পরবর্তীকালে ডুবোহাহাজ-এসেছে কিন্তু তাই বলে ভবিষ্যতে পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবেই—এ কথা বলা চলে না। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সামান্যতম হলেও একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে, কিন্তু পরলোকতত্ত্বকে বিজ্ঞান সমর্থন করে না। বরং বহু তথাকথিত ভৌতিক ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে দেয় বিজ্ঞান। ধরা যাক, প্ল্যানচেটের কথা। এমন অনেকের দেখা মিলবে যারা জোরগলায় বলবেন মরণপারের জগতের সঙ্গে তারা যোগস্থাপন করতে পেরেছেন প্লানচেটের মাধ্যমে। এদের সবাইকে আমরা মিথ্যেবাদী বলতে পারিনা, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পারি প্রতিটি ঘটনার।

বিখ্যাত কবি অমিতাভ দাশগুপ্তর মা কনক দাশগুপ্ত আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন। একবার তিনি অপর দুই মহিলার সঙ্গে প্ল্যানচেট করতে বসে স্মরণ করছিলেন 'শতদল' নামের কোন মহিলাকে। এ দিকে কনক দেবীর পিসীমার নামও শতদল—তিনি ছিলেন

এইরকম সাধারণ সূত্র যদি পূর্বে আবিষ্কৃত না হত, তাহলে মাপজোখ, কৌণিক মাপ, ইত্যাদি ঠিক রেখে কখনই একটা পৃথিবী বা কোন একটি দেশের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে একটা নির্ভুল মানচিত্র বা ঐ জাতীয় কিছু তৈরি সম্ভব হত না।

দেবাশীষ বাবু প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন যে, দ্বিতীয় সূত্রটি জানা থাকলে খুব সহজেই পরিব্যাসার্ধ, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

কিন্তু অতবড় জ্যামিতির প্রমাণের অবতারণা না করে আরও সহজেই সাধারণ ত্রিকোণমিতির সাহায্যেই উহার মান বের করা যায়।

উনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন, '10cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের যে জ্যা দ্বারা ছিন্ন উপচাপ পরিধিতে 30° কোণ করে তার দৈর্ঘ্য—

$$C=\frac{R}{\frac{1}{2}\text{ Cosec A}}=\frac{10\text{cm}}{\frac{1}{2}\times\text{Cosec }30^\circ}=\frac{10\text{cm}}{\frac{1}{2}\times 2}=10\text{ cm.}$$

কিন্তু কোনও অংক না করেও এর উত্তর বলা যায় যেমন—

পরিধিস্থ কোণ 30° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ 60° হবে। এবং কেন্দ্র ও জ্যা সম্পর্কিত উপপাদ্য থেকে জানা যায় যে,

'ব্যাস নয় এরূপ কোনও জ্যা এর উভয় পার্শ্ব সরলরেখা দ্বারা বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করলে বৃত্তের পরিধির ওপর যে দুটি কোণ উৎপন্ন হয় তারা পরস্পর সমান।'

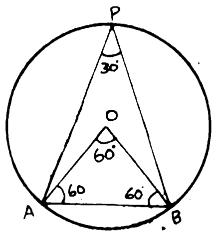

FIG-1

অর্থাৎ চিত্র-1 এ O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB জ্যা। OA ও OB সংযুক্ত।

$\therefore\ \angle OAB=\angle OBA.$

এস্থলে যদি কেন্দ্রস্থ কোণ 60° হয় অর্থাৎ $\angle AOB=60^\circ$ হয়, তাহলে ত্রিভুজটি সমবাহু হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে OA বা OB ব্যাসার্ধ 10 cm. হলে AB ও 10 cm. হবে।

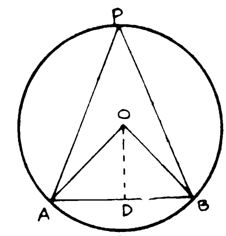

FIG 2

কিন্তু যদি পরিধিস্থ কোণ অন্য রকম হয় তাহলে একটু অংক করতে হয়। ধরি, পরিধিস্থ কোণ $\angle APB$ (চিত্র-2) $=45^\circ$.

$\therefore$ কেন্দ্রস্থ কোণ $2\times45^\circ=90^\circ$.

$\therefore\ \angle OAB=\angle OBA=45^\circ$.

O থেকে AB-এর ওপর OD লম্ব টানা হল। $\therefore$ AD = DB হবে।

$\therefore$ এস্থলে OA = 10 cm. $\angle OAD=45^\circ$ AD = ? [$\triangle OAD$ এর মধ্যে] $\frac{OA}{AD}=\text{Sec }45^\circ=\sqrt{2}$.

$\therefore\ \frac{10}{AD}=\sqrt{2}.\quad\therefore\ AD\sqrt{2}=10.$

or, $AD=\frac{10}{\sqrt{2}}=\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=5\sqrt{2}.$

$\therefore\ AD=5\sqrt{2}$ cm.

$\because\ AD=DB.\quad\therefore\ AB=5\sqrt{2}+5\sqrt{2}=10\sqrt{2}$ cm.

$\therefore$ অতি সহজ ত্রিকোণোমিতির উপায়েও সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়।

অনিরুদ্ধ সরকার, 2, কলেজ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

অত্যন্ত ধর্ম প্রাণা মহিলা—থাকতেন কোনো একটি আশ্রমে। উইজা বোর্ড নড়ে উঠতে তিনি প্রশ্ন করেন—আপনি কে? উত্তরে উইজা বোর্ড ঘুরে ঘুরে জবাব লেখে—শতদল—কনকের—পিসীমা।'

মজার কথা এই যে, পিসীমা সে সময় জীবিতই ছিলেন!

কনকদেবী আমাকে বলেন, তিনি মনে করেন যে, সাধক সাধিকারা ইচ্ছেমতো সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করতে পারেন। পিসীমা ছিলেন একজন উঁচুস্তরের সাধিকা, সূক্ষ্মদেহে বিচরণরত অবস্থায় তিনি ধরা দিয়েছিলেন প্রেতবৈঠকের আহ্বানে। আসলে কনকদেবী যেহেতু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাই সামনে পড়ে থাকা অতিস্পষ্ট কারণটিকে ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন এক কল্পনাশ্রয়ী ব্যাখ্যার। প্ল্যানচেটে যদি জীবিত মানুষ 'এসে পড়েন' তবে তার একটি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত—প্ল্যানচেট মিথ্যে। কনকদেবী যখন প্রেতবৈঠকে শতদল নামের কাউকে স্মরণ করছিলেন, তখন তাঁর অবচেতন মনে ছিল পিসীমার স্মৃতি। ফলে প্ল্যানচেটে পিসীমার সাড়া পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড বলেছিলেন—মানুষের আচরণ যে সবসময় চেতন মনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নয়, নির্জ্ঞান মনই মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করে আচরণকে।

তবু ভাল লাগল পত্রলেখকের মানুষের ক্ষমতার প্রতি আস্থা দেখে। বিশ্বাস থেকেই আমরা প্রতারিত হই বেশি। পত্রলেখকের কাছে অনুরোধ, পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এমন একটি অলৌকিক ঘটনা নিয়ে নিজে একবার তদন্ত করে দেখুন। আত্মা, জন্মান্তর, পরলোকের ফাঁকিবাজি আপনার চোখে ধরা পড়বে।

কাজল ভট্টাচার্য, 65/1 সাতপুকুর বাগান, কলি-2

গত ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় সুজিৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'ইণ্টারফেরন' সম্পর্কে পড়লাম। এই অল্প কথায় ইণ্টারফেরন নিয়ে লেখার দুঃসাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। বক্তব্যের বিষয়ে কিছু অসামঞ্জস্য সম্পর্কে জানাই। তিনি লিখেছেন ইণ্টারফেরন প্রোটিন ধর্মী। কিন্তু ইণ্টারফেরনের Species specificity-র জন্য কার্বোহাইড্রেট পরিমাণের তারতম্যকে দায়ী করেছেন। বস্তুত, ইণ্টারফেরন প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের একটি জটিল (complex) পদার্থ, সুতরাং কেবলমাত্র প্রোটিন ধর্মী ব'ললে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায় নাকি ?

invitro ও *invivo* কি শুধু মাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় ? ইণ্টারফেরনের দুরকম প্রতিক্রিয়াকে আশাকরি বিজ্ঞানের ভাষায় *invitro* বা *invivo* বলে না। অথচ লেখাটি পড়লে, হঠাৎ করে তাই মনে হয়। ফলে *invitro* বা *invivo* কথাদুটির সাথে পরিচিত না হলে হয়তো বা ভুল ধারণাও জন্মাতে পারে। এছাড়াও আরও একটি প্রশ্ন হ'ল যে, কোষের ভিতর প্রতিরোধ গড়ে তোলা, কোষ বিভাজন বন্ধ করা কি *invivo* প্রতিক্রিয়া নয় ?

কোন কোষ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে ইণ্টারফেরন উৎপন্ন হয়, কিন্তু, ঐ ইণ্টারফেরন, আক্রান্ত কোষকে রক্ষা করতে পারে কি ? পার্শ্ববর্তী কোষগলি ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় মাত্র কিন্তু জানা গেছে ইণ্টারফেরন সৃষ্টির ফলে পূর্ব থেকে আক্রান্ত কোষের কোন উপকার হয় না। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ভাইরাস ছাড়াও পলিনিউক্লিওটাইড, মাইটোজেন-এর দ্বারা ইণ্টারফেরন উৎপন্ন হতে পারে।

ইণ্টারফেরন আবিষ্কৃত হয় 1957 সালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 31 বছর আগে। যদিও এই তথ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় তবু '26 বছর আগে' কথাটা ভুলই বলা যেতে পারে।

জানি না কেন লেখা হয়নি, তবে আমার মনে হয় ইণ্টারফেরন সম্বন্ধে আরও তথ্য জানানো প্রয়োজন ছিল। যেমন এটি তিন ধরনের হতে পারে ইণ্টারফেরন—α (আলফা, ইণ্টারফেরন—β (বিটা) ও ইণ্টারফেরন—δ (গামা) এবং এদের আণবিক ওজন 10,000 থেকে 1,00,000। এটি অত্যন্ত কম পরিমাণে উপস্থিত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে এবং সেই কারণেই কোষ থেকে একে আলাদা করা কষ্ট সাধ্য। ভাইরাসের হাত থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রক্ষা করলেও কোন কোন ভাইরাস ইণ্টারফেরনে কার্যক্ষমতা নষ্ট করতে সক্ষম ইত্যাদি।

ইণ্টারফেরন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হলে মানব সমাজের প্রভুত কল্যাণ হবে। এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিভাবে পরীক্ষা চলছে তা একবারও বলা হয়নি। উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় খুঁজে বার করতে বিজ্ঞানীরা আজ ভীষণ ব্যস্ত ! জেনেটিক্ কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে ইণ্টারফেরন উৎপন্ন করা সম্ভবও হয়েছে। তবে তা মানব সমাজের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প।

আশাকরি চিঠিটির উদ্দেশ্য লেখক নিশ্চয়ই বুঝবেন। ইণ্টারফেরন নিয়ে লেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি—

সন্দীপকুমার ঘোষ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণী, নদীয়া।

ফেব্রুয়ারি 1989 সংখ্যায় "নিজে নিজে কর" বিভাগে প্রকাশিত "অটো পাওয়ার স্টেশন" লেখাটিতে লেখক অনিরুদ্ধ সরকার পদার্থবিদ্যার একটি সূত্রকে নস্যাৎ করে নতুন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। এরূপ চেষ্টা দেখে শুধু আমরা কেন, কেউই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। আমি সরল যোগ-বিয়োগে প্রবেশ করছি এটা ধরে নিয়ে যে লেখক পাঠশালায় যোগ-বিয়োগ শিখেছেন !

সমগ্র যন্ত্রটি যখন সাম্যবস্থায় কাজ করছে, অর্থাৎ মোটর ঘুরছে, ডায়নামো চলছে এবং আলোও জলছে এবং বাইরে থেকে কোন শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই (হে ধরনী দ্বিধা হও)। এই অবস্থায় মনে করি ডায়নামোতে Input energy-র পরিমাণ E unit. ঘর্ষণের জন্য ডায়নামোতে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ f_{Ed} হয় তবে ডায়নামোর আউটপুট Energy $E-f_{Ed}$ এবং এটা পাওয়া যাবে বৈদ্যুতিক শক্তি হিসাবে। এখানে একটা আলোও জলছে। তার জন্য ব্যয়িত শক্তি E_L হলে motor-এর Input Energy $=E-f_{Ed}-E_L$ motor-এর ঘর্ষণের জন্য ব্যয়িত শক্তি f_{EM} হলে motor-Output energy $=E-f_{Ed}-E_L-f_{EM}$. এখন Energy transport-এর বিভিন্ন পথে Energy toss-এর কথা বন্ধ দিয়েও বলা যায় যন্ত্রটিকে সাম্যবস্থায় থাকতে হলে Output Energy of motor = Input Energy of dianamo হতে হবে। অর্থাৎ $E-f_{Ed}-E_L-f_{EM}=E$, সম্ভব ?

অচ্যুৎ সিন্‌হা, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, শিক্ষা ভবন, বিশ্বভারতী। **মন্মথময় মাজী**, ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসী, লোকপুর, বাঁকুড়া।

মহাকাশের সেই বিচিত্র বস্তু

সমরজিৎ কর

আমাদের সৌর জগৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেও এখন বড় রকম এক বিস্ময়। সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে নয়টি গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। বুধ এবং শুক্রের কোন উপগ্রহ নেই। কেন নেই? এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অজানা। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ, মঙ্গলের দুই। আবার বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুনের অনেকগুলি উপগ্রহ। এরই বা কারণ কী? চাঁদ, মানে পৃথিবীর উপগ্রহটি নিরেট পাথর বলেই মনে করলেন বিজ্ঞানীরা। এখন বলছেন, সেটা ঠিক নয়। তার অভ্যন্তরে সম্ভবত পৃথিবীর মতই উত্তপ্ত বস্তু রয়েছে। বৃহস্পতির অতিকায় একটি উপগ্রহ 'ইও'-তে তো জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিরই সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝামাঝি রয়েছে একটি অঞ্চল। সেই অঞ্চল পথে সূর্যের চারপাশ পরিক্রমণ করছে অজস্র পাথুরে বস্তু। যাদের আয়তন ছোট্ট মার্বেলের আয়তন থেকে শুরু করে বিরাটাকায়। কারোর কারোর ব্যাস 100 মাইলেরও বেশি। এগুলিকে বলা হয় গ্রহাণু বা প্ল্যানেটয়েড অথবা অস্টেরয়েড। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা এক সময় ওই কক্ষপক্ষে সম্ভবত অতিকায় একটি গ্রহ বিচরণ করত। অজ্ঞাত কোন কারণে সেটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই টুকরোগুলিই গ্রহাণু হিসেবে বিচরণ করছে। এরপর রয়েছে ধূমকেতু। সৌর মণ্ডলে বিচরণ করছে অজস্র ধূমকেতু। সেই সুদূর প্লুটো গ্রহেরও ওপার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা এগিয়ে আসে কারোর আয়তন ছোট, কারোর বড়। কোন কোনটি আসে সূর্য পর্যন্ত। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আবার তারা ফিরে যায়। কোন কোনটি বৃহস্পতির, এদিকে আর আসতে পারে না। সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি, তার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তারা গতি পথ পাল্টায়। সেখান থেকে ফিরে যায় তারা যে অঞ্চল থেকে এসেছিল সেই অঞ্চলে। এই ধূমকেতুও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বিরাট এক রহস্য। তাঁদের ধারণা, ধূমকেতুর মধ্যে এমন কিছু কিছু বস্তু আছে যা সৃষ্টির পর থেকে আজো পাল্টায় নি। সে সম্পর্কে জানা গেলে কী ভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হল সেটা হয়ত আরো স্পষ্ট হবে।

আরো আছে। সূর্য, গ্রহ এবং উপগ্রহগুলির মধ্যে বিরাজ করছে ফাঁকা অঞ্চল। এক সময় মনে হত, সে বুঝি বা শুধুই ফাঁকা। একেবারে শূন্য। এখন দেখা যাচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। সৌর মণ্ডলের সব জায়গায় বিরাজ করছে বিশেষ এক ধরনের বাতাস। যাকে বলা হয় সৌর বাতাস। এ বাতাস জন্ম নিচ্ছে সূর্য থেকে। পৃথিবীর বাতাসের মূল উপাদান নাইট্রোজেন এবং অকসিজেন। এ ছাড়া তাতে যৎসামান্য অন্যান্য গ্যাসও থাকে। যেমন হাইড্রোজেন হিলিয়াম, কার্বন ডাই-অকসাইড প্রভৃতি। সৌর বাতাসের প্রধান উপাদান, বলতে গেলে পচানব্বুই শতাংশই এক ধরনের পারমাণবিক কণা—প্রোটন। বাকি অংশ হিলিয়াম এবং নানা রকম আয়ন। সৌর বাতাস সূর্য থেকে জন্ম নিয়ে সৌর মণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ি দেয় সৌরমণ্ডলেরও বাইরে। এছাড়াও সৌর জগতের বাইরে থেকেও সৌর জগতের মধ্যে চলে আসে নানা আকারের বস্তু। যেন একটি বনের পশু যেমন অন্য একটি বনে প্রবেশ করল—কতকটা এই রকম। প্রবেশ করার পর ওই সব বস্তু কখনো কখনো সৌর মণ্ডলের মধ্যেই বন্দী হয়ে যায়। যেমন, আমাদের চাঁদ। বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করছেন, চাঁদ কোন দিনই পৃথিবীর অংশ ছিল না। এটি এসেছিল সৌর জগতের বাইরে থাকে। তারপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে পড়ে বন্দী হয়ে গেছে। ইদানীং একই কথা প্লুটো গ্রহটির সম্পর্কেও বলা হচ্ছে। প্লুটোও নাকি বহিরাগত বস্তু। সৌর মণ্ডলের বাইরে থেকে এসে তার মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে। কয়েক বছর ধরে নতুন একটি গ্রহের কথাও বলছেন বিজ্ঞানীরা। এটি নাকি প্লুটো ছাড়িয়ে অনেক দূরের একটি কক্ষপথে বিচরণ করছে। গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে 'একস', যদিও এখনো তাকে দেখা যায় নি।

গত নব্বই বছর ধরে আরো একটি বস্তু নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। সেও এক মজার ব্যাপার। আকাশের ছবি তুলতে গিয়ে তাতেই প্রথম ধরা পড়ে এই বস্তুটি। তা অনেক কিছুই ধরা পড়ে। সব নিয়ে তো আর

মাথা ঘামান যায় না! তাই বছরের পর বছর অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে, বস্তুটির ছবি তুলে গেছেন তাঁরা। ঠিক গ্রুপ ফোটোর মত। গ্রুপ ফোটো বিশিষ্ট মানুষের দিকেই যেমন সবার নজর থাকে, অন্যান্যদের দিকে কেউ তেমন নজর দেয় না। অনেকদিন ধরে এ ক্ষেত্রেও তাই চলছিল। কিন্তু 1977 সালে হঠাৎ টনক নড়লো বিজ্ঞানীদের। কেমন যেন আজব বস্তু নলে মনে হচ্ছে না? তাঁরা ভাবলেন। এটা কেমন হল? মনে হচ্ছে, বস্তুটির যেন নিজস্ব একটি কক্ষ পথ রয়েছে? বস্তুটির তাঁরা নাম দিলেন চিরন।

সঙ্গে সঙ্গে হই হই পড়ে গেল। সৌর জগৎ বলতে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ। এ ছাড়া রয়েছে 2000 এর মত জানা অ্যাস্টেরয়েড। ছোট বড় গ্রহাণু এবং ধূমকেতু। এগুলির মধ্যে কী পরিচয় 'চিরন'-এর? এটা কি কোন গ্রহ? কোন অ্যাস্টেরয়েড?

বিচিত্র এই বস্তুটির পরিচয় আবিষ্কারে এগিয়ে আসেন প্যাসাডিনার হেন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস টি. কাউয়াল। সেটা 1 নভেম্বর, 1977। পরে এ নিয়ে আরো অনেকে পর্যবেক্ষণ চালান। তাতে দেখা যায়, পৃথিবী থেকে বস্তুটির দূরত্ব 150 কোটি মাইল। দেখা যায়, গ্রহগুলির মত চিরন ও সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে, তার নিজস্ব আলো নেই। কেউ বলছেন, তার ব্যাস 400 মাইল; কেউ বলছেন 60 মাইল। কিন্তু কী তার পরিচয়?

এ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে চলছে নানান জল্পনা। কারোর কারোর মতে, এটি লেজ এবং মস্তকবিহীন একটি ধূমকেতু। আর ধূমকেতুর মত লম্বা পরিক্রমণ পথের দিকে চেয়েই একথা ভাবছেন তাঁরা। আবার কেউ কেউ বলছেন, এটি অ্যাস্টেরয়েড।

কিন্তু অ্যাস্টেরয়েডের জন্যে তো একটি জায়গাই রয়েছে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝামাঝি অঞ্চলে। সেখান থেকে চিরনের বাইরে যাওয়ার মানে কী?

এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যেকার অ্যাস্টেরয়েডগুলি ঠিক যে ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, চিরনও ঠিক সেই ভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু যে কারণেই হোক, এটি বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা ছিটকে দূরে সরে যায়। এবং নিজস্ব কক্ষপথে শুরু করে বিচরণ। এমন কথাও চলা হচ্ছে, 'চিরন' এক সময় শনির উপগ্রহ ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এখন নিজস্ব কক্ষপক্ষে সূর্যকে প্রদাক্ষণ করছে। বৃহস্পতির বৃহত্তম উপগ্রহের ব্যাস আরো কিছুটা বড় হল এ ঘটনা তার ভাগ্যেও ঘটত। কোন সময় 'চিরন' শনির কাছ থেকে দূরে সরে যায়?

ইংলণ্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট ক্যানন স্মিথ মনে করেন, ঘটনাটি ঘটেছিল 1666 খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। অবশ্য তাঁর এই কথাটি এখনো অনেকেই বিশ্বাস করেন না।

এ বছর 'রণজিৎ-স্মৃতি শৈব্যা' পুরস্কার পেলেন শৈল চক্রবর্তী এবং 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পুরস্কার'—দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ প্রদত্ত রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার এ বছর অর্পণ করা হবে প্রবীন শিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক শৈল চক্রবর্তীকে। শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সামগ্রিক বিচারে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ষীয়ান শিল্পী শৈল চক্রবতী প্রায় পাঁচ দশক ধরে ছোটদের জন্য আঁকা ও লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছোটদের জন্য অসংখ্য ছবি আঁকার বই ছাড়াও তিনি অনেক ছড়া ও গল্পের বই লিখেছেন। তাঁর আঁকা ও লেখা 'গাড়ি ঘোড়ার গল্প' এবং ছোটদের ক্রাফ্‌ট রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা প্রবর্তিত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে সম্প্রতি। ছোটদের জন্যে বিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদানের প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর এই পুরস্কার অর্পণ করা হবে দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূ-তত্ব বিভাগে উচ্চপদে আসীন। তিনি দীর্ঘকাল ধরেই ছোটদের জন্য লিখছেন। মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন, খনি থেকে খনিজ পৃথিবী পরিচয়, ভারতের নদ নদী প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শৈব্যা পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ কুমার বলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। উভয় পুরস্কারের আর্থিক মূল্য 500 টাকা।

নিখিলবঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রাপকদের পুরস্কার অর্পণ করা হবে।

—বিশেষ সংবাদদাতা

বিশেষ ত্রিভুজের এক নতুন ধর্ম

আব্দুল হালিম সেখ

একদিন ত্রিভূজ নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎই দেখি—সমকোণী ত্রিভূজের যে কোন কোণের সমদ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে যে দুটো খণ্ডে বিভক্ত করে তারা ত্রিভূজটার অপর দু'টো বাহুর সঙ্গে সমানুপাতী। অনেক উৎসাহে ও আনন্দে এ নিয়ে আরও চিন্তা করে দেখি যে এ সূত্র কেবল সমকোণী ত্রিভূজের বেলায় নয় সমস্ত ত্রিভূজের বেলায় প্রযোজ্য। প্রথমে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে ব্যাপারটা যাচাই করি এবং পরে তা' জ্যামিতির সাহায্যে উপপাদ্যের আকারে প্রমাণ করে অনেক উৎসাহ নিয়ে ছুটে যাই আমাদের ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ-এর কলেজ পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু না, কলেজ পত্রিকার লেখা নেওয়ার সময় গেছে। প্রিন্সিপ্যালকে জানালে তিনি আশ্বাস দেন ব্যাপারটা দেখবেন। এরি মধ্যে এ, মাইতি ও এস. আর. মাইতির লেখা দু'টো ঐচ্ছিক গণিত কিনি। ব্যাশ! ঐচ্ছিক গণিতের (IX) সামতলিক জ্যামিতির 4 পৃষ্ঠা আমার সমস্ত আনন্দ-উৎসাহ একঝাপটে নিভিয়ে দেয়। উপপাদ্যটা 1960, '62 ও '70 খ্রীষ্টাব্দে তিনবার H.S পরীক্ষাতে পড়েছিল। তবে আনন্দের বিষয় এই যে ঐ বই-এর প্রমাণের সঙ্গে আমার প্রমাণের মিল নেই।

যাই হোক এই সূত্র এবং পীথাগোরাসের সূত্রের সাহায্যে আমি এক বিশেষ ধরণের ত্রিভূজের বাহুগুলির একটা সম্পর্ক দেখাব। যে সমস্ত স্থূলকোণী ত্রিভূজের সূক্ষ্মকোণ দু'টোর, একটা অপরটার দ্বিগুণের সঙ্গে পূরক কোণে থাকে, সেই সমস্ত স্থূলকোণী ত্রিভুজের যে কোন দু'টো বাহু জানা থাকলে অপর বাহুটা খুব দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব। তবে সম্পর্কটার নির্ণয়ের দিকটা যাব না কারণ, লেখাটা তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে।

উপরিল্লেখিত ত্রিভূজগুলির বাহুগুলির মধ্যে সম্পর্ক হ'ল নিম্ন রূপ ঃ—

$$C^2 = (a^2 - b^2)^2/a^2 + b^2$$

[যখন ত্রিভূজগুলোর স্থূলকোণের বিপরীত বাহুটা b ; যে কোণের দ্বিগুণ করলে অপর কোণের সঙ্গে পূরক কোণে থাকে সেই কোণের বিপরীত বাহুটা a এবং অপর বাহুটা c দ্বারা সূচিত করে।]

উল্লেখিত সূত্রটার দু'টো অনুসিদ্ধান্ত হল ঃ—

$$(1) \quad b^2 = \frac{2a^2 + c^2 \pm c\sqrt{c^8 = 8a^2}}{2}$$

$$(2) \quad a^2 = \frac{2b^2 + c^8 \pm c\sqrt{c^2 + 8b^2}}{2}$$

[বিঃ দ্রঃ—অনুসিদ্ধান্ত দু'টোতে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথমটার উত্তর b^2 = দু'টো রাশি হবে। একটা বাস্তব এবং অপরটা অবাস্তব। তাই অনুসিদ্ধান্তটা থেকে সর্বদাই অবাস্তব রাশিটা এড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটার বেলায় a^2 = দু'টো ভিন্ন বাস্তব রাশি আসবে। সে কারণে এখানে বর্গমূল থেকে ঋণাত্মক রাশিটাই নিতে হবে।]

এবার একটা অংক তৈরী করে ঐ সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ করে দেখা যাক সূত্রটা এবং অনুসিদ্ধান্ত দু'টো ঠিক আছে কিনা।

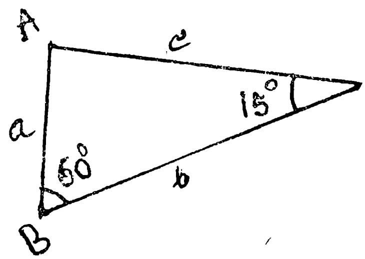

ধরা যাক, ABC একটা ত্রিভূজ। যার $\angle B = 60°$, $\angle C = 15°$ এবং $\overline{BC} = 2$ সেমি। তা'হলে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে পাওয়া যাবে $\overline{AB} = \frac{2}{\sqrt{3}+2}$ সে মি. এবং $AC = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}$ সে মি।

এখন, এখান থেকে একটা অংক লেখা যেতে পারে যে,—$\triangle ABC$ একটা স্থূলকোণী ত্রিভূজ, যার $2\angle C + \angle B = 90°$ ত্রিভূজটার $\overline{AB} = \frac{2}{\sqrt{2}+2}$ সে. মি. এবং $\overline{BC} = 2$ সে.মি. হলে $\overline{AC}$ = কত ?

এবার পূর্বে উল্লেখিত সূত্রটার সাহায্যে অংকটা সমাধান করা যায় কিনা দেখা যাক।

$\because$ ত্রিভূজটার $\angle C$-এর দ্বিগুণের সঙ্গে $\angle B$ পূরক কোণে আছে—

$\therefore$ $\angle C$-এর বিপরীত বাহু $\overline{AB} = a$.

$\because$ $2\angle C + \angle B = 90^\circ$

$\therefore$ $\angle A$ স্থূলকোণ

$\therefore$ স্থূলকোণের বিপরীত বাহু $\overline{BC} = b$ এবং অপর বাহুটা $\overline{AC} = c$ ধরা যাক।

আমরা একটু আগে জেনেছি যে এ ধরনের ত্রিভূজগুলির বাহুগুলির সম্পর্ক হ'ল—

$$C^2 = (a^2 - b^2)^2 / a^2 + b^2$$

এবং যেহেতু এই অংকটায় a এবং b জানা আছে—

$$\therefore \quad C^2 = \frac{\left\{\frac{4}{(\sqrt{3}+2)^2} - 4\right\}^2}{\frac{4}{(\sqrt{3}+2)^2} + 4}$$

$$= \frac{16(1-3-4\sqrt{3}-4)^2}{(\sqrt{3}+2)^4} \times \frac{(\sqrt{3}+2)^2}{4(1+3+4\sqrt{3}+4}$$

$$= \frac{4\,(6+4\sqrt{3})^2}{(\sqrt{3}+2)^2(8+4\sqrt{3})} = \frac{4\cdot 12\,(\sqrt{3}+2)^2}{4\,(\sqrt{3}+2)\,(\sqrt{3}+2)^2}$$

$$= \frac{12}{\sqrt{3}+2}$$

$$\text{or,} \quad c = \sqrt{\frac{12}{\sqrt{3}+2}} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}$$

যেহেতু C একটা ধনাত্মক মান হবে—

$$\therefore \quad C = \overline{AC} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2} \text{ সে.মি.।}$$

অনুরূপভাবে, $\overline{AB}$ ও $\overline{AC}$ অথবা $\overline{AC}$ ও $\overline{BC}$ জানা থাকলে পূর্বে উল্লেখিত অনুসিদ্ধান্ত দু'টোর সাহায্যে বিঃ দঃ-এর নিয়ম মেনে যথাক্রমে $\overline{BC}$ অথবা $\overline{AB}$ নির্ণয় করা যায়।

এই বিশেষ ধরনের ত্রিভূজের যে কোন দু'টো বাহুর দৈর্ঘ্য জানা থাকলে অপর বাহুটার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের এটা নতুন পদ্ধতি বলে যদি কেউ মনে করেন এবং এখান থেকে নতুন কিছু জানলেন বলে মনে করেন তা'হলে খুব উৎসাহিত হবো। এবং পরে সূত্রটার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

গ্রাম+পোষ্ট ঃ কুমার হাট, বারুইপুর, দক্ষিণ-24 পরগণা

বিজ্ঞান সংবাদ

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের অষ্টম বার্ষিক স্মরণ সভা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের অষ্টম বার্ষিক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল গত 8 এপ্রিল 1989 সন্ধ্যায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে। এই স্মরণ-সভার আয়োজন করেছিলেন গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পরিষদ সভাপতি জয়ন্ত বসু। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরি প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত বিজ্ঞান সাধকের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন সুকুমার গুপ্ত, অনিল বরণ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শিবচন্দ্র ঘোষ !

সৌরশক্তি বিষয়ক সামগ্রী ও চুল্লীর জনপ্রিয়করণ।

গত রবিবার 9 এপ্রিল, 1989 তিনজলার থানা অন্তর্গত চৌবাগা গ্রামে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন অফ বেঙ্গল এবং যাদবপুর রোটারী ক্লাবের যৌথ পরিচালনায় সৌরশক্তি সামগ্রী ও ধোঁয়াহীন চুল্লীর ব্যবহার শীর্ষক গ্রামীণ গৃহিনীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ 24 গরগণা রোটারী ইণ্টার ন্যাশানালের গর্ভরনর শ্রী শ্যামল দত্ত। শ্রী দত্ত তার ভাষণে বলেন—বিজ্ঞানীরা যে সব সামগ্রী সাধারণ মানুষের জন্য এতো কষ্ট করে গবেষণা করছেন, সেগুলো অন্ততঃ একবার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে দেখা দরকার যে, সেসব সামগ্রী সত্য সত্যই মানুষের কাজে লাগবে কিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সত্যেশ চন্দ্র পাকড়াশী। সভাপতি, যাদবপুর রোটারী ক্লাব বলেন—এই ধরনের সৌর শক্তির প্রয়োগ করে মানুষ নিশ্চয়ই ফললাভ করবে।

এপ্রিল '89 সংখ্যায় প্রকাশিত 'সিনেমা দেখা' রচনাটির লেখিকার নাম জুঁই কুণ্ডু পড়তে হবে।

আবিষ্কারের গল্প

ডায়নামো

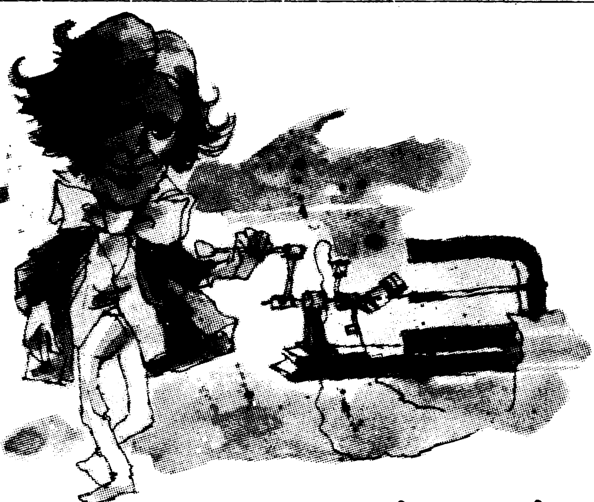

বসেছিলুম ঘরে। দরজা ঠেলে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল জিজা। পিঠে স্কুল-ব্যাগ। আমি বললুম, "কিরে কোথায় গিয়েছিলি ?" "—তুমি জাননা বুঝি আজ থেকে আমাদের সকাল স্কুল শুরু হোল তো।' 'ও তাই বুঝি'—বলে আমি মুখ ফেরালুম। 'কাকু' জিজা আবার ডাকল, তুমি একটু দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি। তোমায় একটা ম্যাজিক দেখাবো।"—"কি ম্যাজিক ?"—আমার কথার উত্তর না দিয়ে কাঁধ থেকে ব্যাগটা খুলতে খুলতে ঘরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল, হাতে একটা সাদা কাগজ আর মুঠোর মধ্যে কি সব নিয়ে। এসেই বলল, "দুহাত দিয়ে এই কাগজটা ধর।" আমি ধরলুম ! তারপর একটা আলপিন রাখল কাগজটার ওপর। "দেখ এইবার আমার ম্যাজিক।"—বলে হাতটা মুঠো করে কাগজের তলায় আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের আলপিনটাও নড়তে লাগল। আমি হাসতে হাসতে বললুম। "জানিস, হাদারাম, তোরই মত একটা দুষ্টু ছেলে এই রকম চুম্বক নিয়ে খেলতে খেলতে একটা বড় জিনিস আবিষ্কার করেছেন। জিনিসটার নাম হল ডায়নামো।

ম্যাজিসিয়ানের কায়দা দর্শক জেনে ফেললে ম্যাজিসিয়ান মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। জিজাও হত না যদি না একটা গল্পের গন্ধ পেত আমার কথায়।

জিজ্ঞেস করল।—"কি নাম ছেলেটার ?"

বললুম, "মাইকেল ফ্যারাডে। 1791 সালের 22শে নভেম্বর সারের নিউইংটন বাটস-এ জন্মেছিল ছেলেটি। তার বাবা ছিল পেশায় মুচি। 1812 সালে স্যার হামফ্রে ডেভির দেওয়া বিজ্ঞানের ওপর কিছু বক্তৃতা শুনে ফ্যারাডে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই সময় বই বাঁধাই ছিল তার পেশা। একদিন হামফ্রে ডেভির সেই বক্তৃতার নোট সমেত তার কাছে চাকরি চেয়ে একটা আবেদন পাঠালেন ফ্যারাডে। 1813 সালে হামফ্রে ডেভির সহযোগী হয়ে রয়েল ইনস্টিটিউটে তিনি কাজ শুরু করলেন। (এই হামফ্রে ডেভির কথা পরে বলব) চুম্বক এবং চুম্বক শক্তির ওপর তার ঝোঁক ছিল বেশি। এরপর 1831 সালে ফ্যারাডে চুম্বক এবং লোহা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন যে চুম্বক লোহার টুকরোগুলোকে তার চারপাশে ঘোরাতে পারে। চুম্বকের এই শক্তিকেই তিনি বললেন চুম্বক শক্তি।

একটা পাকানো তারের কুণ্ডলীকে একটা ঘোড়ার খুরাকৃতি চুম্বকের দুই প্রান্তের মধ্যে ঘোরাতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। তিনি এইভাবে চুম্বক শক্তিকে রূপান্তরিত করলেন। ডায়নামো আবিষ্কার হল। এখন আমরা এই ডায়নামোর সাহায্যেই অন্য শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি।

থেমে জিজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ও চোখ গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওর গালটা টিপে দিয়ে বলি। "আর তার ফলে সকাল বেলাতেই তোমার প্রিয় টোস্ট তৈরী।"

জিজার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর —'আর তোমার চা ?"

অলয় ঘোষাল

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার / চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

রাতের শুরুতে মাস্তুলে মাস্তুলে তুলে দেওয়া হোল আলো। তিনটি জাহাজেই অবিশ্বাস্য নাবিকদের চাঞ্চল্য—কে আগে ডাঙা দেখবে। দশ হাজার ম্যারাভেডিসের বার্ষিক পুরস্কার সবারই চোখের সামনে তখন নাচছে।

সারাটা রাত সমুদ্র অস্থির হয়ে রইলো। উত্তাল সাগরের দোলন দোলায় দুলতে লাগলো তিনটি জাহাজ। পাটাতনের উপর অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন তিনজন ক্যাপ্টেন। তাঁদের দৃষ্টি বারবার সন্ধান করে ফিরছে পশ্চিমের চক্রবাল। এখনো কতোদূর? রাত প্রায় দশটায় কলম্বাস দেখতে পেলেন একটা আলো—মোমবাতির মতো ক্ষীণ। উঠছে আর নামছে। জাহাজের উপর রুদ্ধশ্বাসে সবাই দাঁড়িয়ে। কিন্তু হায়, হঠাৎ করে আলোটা হারিয়ে গেল। আর দেখা গেল না।

জ্যোৎস্নাভরা আকাশে অগণ্য তারা। মধ্যরাত পার হয়ে গেছে কখন। শুরু হয়ে গেছে 12 অক্টোবর। এখন কলম্বাসের চোখেও ঝিমুনি। রাত ঠিক দুটোয় পিনটার সামনে থেকে একজন নাবিক অত্যন্ত ধারালো তার দৃষ্টি, রডারিগো ডি ট্রিয়ানা—আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—ডাঙা, ডাঙা, আমি ডাঙা দেখতে পেয়েছি।

খবর ছুটে গেল আরও দুটি জাহাজে। কলম্বাস দেখলেন, না, আর ভুল হতে পারে না। চাঁদের আলোয় স্বপ্নময় হয়ে আছে অজস্র বালিয়াড়ি।

বাকী সারা রাত কী আবেগ, কী উত্তেজনায় সবাই নিথর

—একমন একপ্রাণ হয়ে নাবিকরা দাঁড় টেনে টেনে চললো। 12 অক্টোবর সকালে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠলো সবুজ পৃথিবী। কুমারী মাটির বিপুল সৌন্দর্যে কলম্বাস বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 6 মাইল দূরে দ্বীপভূমি বেষ্টন করে গলায় হারের মতো চলে গেছে প্রবাল প্রাচীর। বেলাভুমিতে সবুজ অরণ্য সকালের বাতাসে হিল্লোল তুলে যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে দুঃসাহসী যাত্রীদের। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে

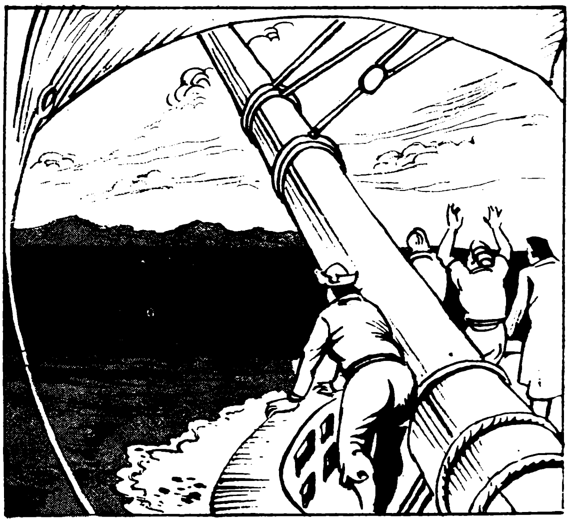

উলঙ্গ মানুষ—অসীম কৌতুহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে সুসভ্য আগন্তুকদের।

তীরের কাছে একটা নৌকা নিয়ে এবার বিজয় গর্বে কলম্বাস নেমে গেলেন দ্বীপের মাটিতে। সঙ্গে মার্টিন আর ভিনসেণ্ট, কয়েকজন নাবিক। জাতীয় পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে সবাই অপার গর্বে চঞ্চল। হাতে ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলার নামাঙ্কিত দুখানি পতাকা। নতুন ভূমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে কলম্বাস নতজানু হলেন। অপরাহত অভিযাত্রীর দুচোখে জলের ধারা। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি প্রার্থনায় বসলেন। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁকে বেষ্টন করে সবাই নতজানু। কলম্বাস নিজের হাতে সেই পতাকাদুটি মাটিতে পুঁতে দিয়ে ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলার নামে দ্বীপের দখল নিলেন। নামকরণ করলেন—'সান সালভাডোর।' নাবিকের দল এবার এক সুরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো—জয় কলম্বাসের জয়। নতজানু হয়ে তারা প্রার্থনা করলো—হে মহান আবিষ্কারক, আমরা আজীবন আপনার অনুগত থাকার শপথ নিলাম। আমাদের সব দোষ এবার মার্জনা করে নিন।

শুরু হোল কলম্বাসের জীবনের উজ্জ্বলতম আকাঙ্খিত দিন। আবাল্য স্বপ্ন এবং সযত্নলালিত সাধনার পরিপূর্ণতা নিয়ে এলো 1492 খ্রীষ্টাব্দের 12 অক্টোবর। আজ তিনি এক দুঃসাহসী অভিযাত্রীই শুধু নন, ইতিহাসের পাতায় তাঁর পদচিহ্ন এখন এক মহান আবিষ্কারকের। যদিও তখনও কলম্বাস জানেন না, সভ্য পৃথিবীর সামনে ইতিহাসের যে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার তিনি তুলে দিয়েছেন, তা এক অনাবিষ্কৃত গোলার্ধের; এক সুবিশাল ঐশ্বর্যবান ভূখণ্ডের। তিনি শুধু জানেন—স্বর্ণবিভাসিনী ভারতের সুদীর্ঘ পরিচিত পূর্বাভিমুখী জলপথের পরিবর্তে তিনি এনে দিয়েছেন এক হ্রস্বতম পশ্চিমাভিমুখী সরল জলপথ। তাঁর মতবাদ অভ্রান্ত, তাঁর গণনা নির্ভুল। রাজা ফার্দিনান্দ এবং রাণী ইসাবেলার সামনে যে উপাধি তিনি দাবী করেছিলেন, আনন্দাভিভূত সহযাত্রীর দল সেই বিরল দুটি উপাধিতে মহানাবিককে বিভূষিত করলেন—'মহাসমুদ্রের সর্বাধিনায়ক', 'ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজপ্রতিনিধি এবং রাজ্যপাল।'

নতুন পৃথিবীর আকাশে এখন ঝলমল করছে সোনার সূর্য। পরিতৃপ্ত কলম্বাস মহান পরিত্রাতার নামে তাঁর নবনামাঙ্কিত ভূখণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করলেন—পৃথিবী গোলকাকার। সমুদ্রের তরঙ্গের মতোই তা প্রতিনিয়ত স্পন্দমান।

(ক্রমশ)

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম কুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

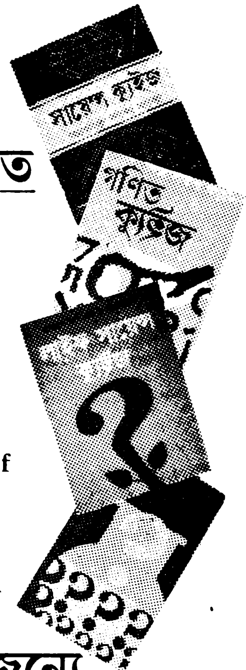

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—The Statesman

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

মজার সংখ্যা-13

মিঠু মাইতি

অধিকাংশের ধারণা 13 হচ্ছে অশুভ সংখ্যা, চলতি কথায় যাকে বলে—'UNLUCKY THIRTEEN।' তাই, কারোর কাছে যখন 13 উপস্থিত হয় তখন তাঁরা মনে করে এবার বুঝি দুর্ভাগ্যের সূচনা হলো। যেমন—'7' সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। উপরোক্ত মন্তব্যগুলো নিছক কু-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা সত্যতা নেই। অংকের বিচারে 13-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আছে বিভিন্ন মজার অথচ বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ। এবার প্রয়োগের কথায় আসা যাক্।

A. 13 হচ্ছে সবচেয়ে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা (The smallest prime) থাকে দুটি digit-এর বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায়।

যেমন : $13 = 2^2 + 3^2$

B. 13-থেকে এর digit-দ্বয়ের যোগফলকে বিয়োগ দিলে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাওয়া যায়।

যেমন : $13 - (1 + 3) = 9 = 3^2$.

C. 13-কে এর digit-দ্বয়ের গুণফলকে যোগ করলে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাওয়া যায়।

যেমন : $13 + (1 \times 3) = 16 = 4^2$.

D. 13-কে বর্গ করলে হয় 169 (অর্থাৎ, $13^2 = 169$)। এই 169 থেকে অসংখ্য বর্গ সংখ্যা পাওয়া যায়।

(i) 169-এর digit-এর যোগফল একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা। উক্ত সংখ্যাই আবার মূল সংখ্যা (13)-র digit-দ্বয়ের সমষ্টির বর্গ!

যেমন : $1 + 6 + 9 = 16 = 4^2 = (1 + 3)^2$.

(ii) 169-এর প্রথম digit-দ্বয় এবং অন্তিম digit-এর যোগফল এবং গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।

যেমন : $16 + 9 = 25 = 5^2$

$16 \times 9 = 144 = 12^2$.

(iii) 169-কে দুটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায়।

যেমন : $169 = 13^2 = 5^2 + 12^2$.

(iv) 169-এর প্রথম digit-দ্বয় এবং অন্তিম digit-এর যোগফল এবং গুণফলের সমষ্টিই 169।

যেমন : $169 = (16 + 9) + (16 \times 9)$.

E. 13-কে ভিন্ন উপায়ে দুটি ভগ্নাংশের বর্গের সমষ্টিরূপেও প্রকাশ করা যায়।

যেমন : $13 = \left(\frac{18}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2$.

F. 13-কে দুটি ভগ্নাংশের ঘনের (cube) সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায়।

যেমন : $13 = \left(\frac{7}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^3$.

G. 7-এর বর্গ 49 (অর্থাৎ, $7^2 = 49$)। এই 49-এর digit-দ্বয়ের সমষ্টিই হচ্ছে 13।

যেমন : $7^2 = 49$

$13 = 4 + 9$.

H. 13-এর ঘনমান হচ্ছে 2197 (অর্থাৎ $13^3 = 2197$)। উক্ত 2197-এর digit-গুলোর স্থান পরিবর্তন করলে আমরা বিখ্যাত 'রামানুজন সংখ্যা'-1729-কে পাই।

1729 হল এমন একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা (The smallest prime) যাকে দু'ভাবে দু'টো সংখ্যার ঘনফলের যোগফল রূপে প্রকাশ করা যায়। এই '1729'-কে বলা হয় রামানুজন সংখ্যা। প্রখ্যাত ভারতীয় সংখ্যাবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজন (1887—1920) এটি আবিষ্কার করেন।

$\therefore\ 1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3$.

I. উক্ত 1729-এর উৎপাদকত্রয় যথাক্রমে 7, 13 এবং 19। 7, 13 এবং 19-কে যোগ করে 3 দিয়ে ভাগ করলে, প্রাপ্ত ভাগফল 13 হয়।

যেমন : $1729 = 7 \times 13 = 19$.

আবার, $13 = (7 + 13 + 19) \div 3$.

J. 13-কে উল্টে লিখলে হয় 31। এখন 13-এর পাশে 31 স্থাপন করলে হয়—1331। এটি একটি ঘনসংখ্যা।

যেমন : $1331 = 11^3$.

K. পূর্বেই জেনেছি 13-র বর্গ 169 এবং 13-কে উল্টে লিখলে হয়—31। এই 31-র বর্গ 961 (অর্থাৎ $31^2 = 961$)। লক্ষণীয় বিষয় যে, 13-র বর্গ 169-র digist ত্রয়ের স্থান পরিবর্তন করলে 961-ই হয়।

L. 13-র অন্যোন্যক (reciprocal) 1/13। এর মান 0·076923। তার থেকে 76923 নিয়ে তাকে 13 দ্বারা পর্যায় ক্রমে গুণ করলে এক চমকপ্রদ গুণফলের সমাহার দেখা যায়।

যেমন ঃ $1/13 = 0{\cdot}76923.$

তখন,
$$76923 \times 13 \times 1 = 0999999$$
$$76923 \times 13 \times 2 = 1999998$$
$$76923 \times 13 \times 3 = 2999997$$
$$76923 \times 13 \times 4 = 3999996$$
$$76923 \times 13 \times 5 = 4999995$$
$$76923 \times 13 \times 6 = 5999994$$
$$76923 \times 13 \times 7 = 6999993$$
$$76923 \times 13 \times 8 = 7999992$$
$$76923 \times 13 \times 9 = 8999991$$
$$76923 \times 13 \times 10 = 9999990$$

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রাপ্ত গুণফলের শুরুর বাম দিকের digit 0 থেকে 9 পর্যন্ত এবং ডান দিকের digit-9 থেকে 0 পর্যন্ত। আরো দেখা যাবে যে একেবারে উপরে যে digit-গুলো আছে একেবারে শেষে তার ঠিক উল্টোটা আছে। আবার তেমনি দ্বিতীয় সারি digit-গুলোর উল্টোটা আছে শেষের আগের পদটিতে। এমনি করে পর্যায়ক্রমে যা আছে তার ঠিক উল্টোটাই পরিলক্ষিত হয়।

পুনশ্চঃ প্রয়োগ ভঙ্গীমায় যেমন নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি অবসর সময়ের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কারণ সংখ্যার যে মজার অথচ বুদ্ধি-দীপ্ত প্রয়োগ তা এর গভীরতায় প্রবেশ করলে ধরা পড়ে। শুধু 13-ই নয়, এরকম আরো অনেক সংখ্যা আছে, যাদের রহস্য রাজ্যে প্রবেশ করে চিত্তবিনোদন করা যায়।

20 এ, জয়কৃষ্ণ পাল রোড, কলিকাতা-38।

মজার অঙ্ক

কাজল ভট্টাচার্য

১

তোমার বন্ধুকে একখণ্ড কাগজ দিয়ে তাতে তোমাকে না দেখিয়ে তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে বলো। তবে প্রথম ও শেষ অংকের মধ্যে অন্তত 2 অথবা তার চেয়ে বেশি ফারাক থাকতে হবে। এবার বন্ধুকে বল সংখ্যাটি উল্টে নিয়ে বড় থেকে ছোট সংখ্যাটিকে বিয়োগ দিতে। বিয়োগ ফল যা বেরোবে সেটিকে আবার উল্টে নিয়ে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে। তোমার বন্ধু যতক্ষণ অংক নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তার মধ্যে কাগজে উত্তরটা লিখে ফেল—1089। বন্ধু এতে অবাক হয়ে যাবে। নিয়ম মেনে খেলাটা দেখালে প্রতিবার একই উত্তর হবে—সে কারণে একজনকে একবারের বেশি দেখানো নিরাপদ নয়! নীচে একটা নমুনা অংক করে দিলাম —

$$732 - 237 = 495$$
$$495 + 594 = 1089.$$

২

প্রথমে একটা সাদা কাগজে লিখে ফেল 12345679 সংখ্যাটি। এটি তোমার জাদু সংখ্যা বা magic number; আর মনে রাখাও খুব সহজ কারণ এতে 8 বাদে সবকটি সংখ্যাই ধারাবাহিক রয়েছে।

এবার একজন বন্ধুকে ডেকে জানতে চাও 1 থেকে 9-এর মধ্যে তার প্রিয় সংখ্যা কোনটি। সে যে সংখ্যাটি বলবে তাকে 9 দিয়ে গুণ দাও। গুণফল বসাও জাদুসংখ্যার নীচে। ধরো, যদি সে 5 পছন্দ করে তাহলে তুমি জাদুসংখ্যার নীচে $5 \times 9 = 45$ বসাবে। এবার এই সংখ্যাটি দিয়ে জাদুসংখ্যাকে গুণ করতে বল বন্ধুকে। ফলাফল দেখে বন্ধু চমকে যাবে কারণ গুণফলের সবকটি সংখ্যাই হবে 5—অর্থাৎ তার পছন্দের সংখ্যা। তোমাদের জন্যে অংকের পুরোটা তুলে দিচ্ছি—

$$5 \times 9 = 45$$

```
 12345679
       45
---------
 61728395
49382716×
---------
555555555
```

এই কৌশল 1 থেকে 9-এর মধ্যে সবসংখ্যার ওপরেই ব্যবহার করা যাবে। করেই দেখো না!

সেভেন ট্যাংকস্ এস্টেট, কলকাতা-700002।

পৃথিবীকে কি তুলে ধরা সম্ভব

সমীর কুমার ঘোষ

বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের নাম বিজ্ঞানের সব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই পরিচিত। জলের প্লবতা সংক্রান্ত বিখ্যাত আর্কিমিডিসের সূত্র, বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের এক মূল স্তম্ভস্বরূপ। এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে একটি বহুল প্রচারিত গল্প শোনা যায়। কথিত আছে যে তিনি নাকি একবার বলেছিলেন যে, 'আমাকে যদি ভালভাবে চেপে ধরবার মত উপযুক্ত একটি দণ্ড দেওয়া হয়, তবে ঐ দণ্ডের সাহায্যে আমি পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃতপক্ষে আর্কিমিডিসই সর্বপ্রথম ভারোত্তোলন দণ্ড (Lever) আবিষ্কার করেন এবং সেই প্রসঙ্গেই তিনি ঐ রকম মন্তব্য করেন। আরো প্রচলিত আছে যে, আর্কিমিডিসের নাকি বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের এই পৃথিবীর কাছাকাছি যদি আর একটি পৃথিবী পাওয়া যেত, তবে তার উপর দাঁড়িয়ে তিনি ঐ ভারোত্তোলন দণ্ডের সাহায্যে চাপ দিয়ে সহজেই আমাদের এই পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারতেন।

ভারোত্তোলন দণ্ড বা lever আবিষ্কার করে আর্কিমিডিস দেখিয়েছিলেন যে, অতি অল্প বলের সাহায্যে ঐ দণ্ড দিয়ে ভ্রামকের সূত্রের ভিত্তিতে, খুব ভারী যে কোন জিনিস তুলে ধরা যায়। ঐ দণ্ডের বৃহত্তম অংশে সামান্য বল প্রয়োগ করে। ক্ষুদ্রতর অংশের সঙ্গে যুক্ত যে কোন ভারী জিনিসকে তুলে ধরা সহজেই সম্ভব।

আর্কিমিডিসের পৃথিবীকে তুলে ধরার ব্যাপারটা কথার কথা হ'লেও, তর্কের খাতিরে না হয় ধরাই গেল যে, দ্বিতীয় আর একটি পৃথিবী পাওয়া গেল এবং হাত দিয়ে ভাল করে ধরবার মত উপযুক্ত খুঁটি সমেত একটি ভারোত্তোলন দণ্ডও পাওয়া গেল। এখন আনুমানিক একটা হিসাব করে দেখা যাক যে, এই দণ্ডের সাহায্যে পৃথিবীর সমপরিমাণ ভরের একটি বস্তুকে এক সেন্টিমিটার উঁচুতে তুলতে কত সময় লাগবে বা ঐ দণ্ডের দৈর্ঘ্যই বা কত হবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপর যদি তার সমপরিমাণের কোন বস্তু থাকে, তবে সেই বস্তুটির ওজন হবে প্রায় 6×10^{21} টন। সুতরাং যদি ধরা যায় যে, কোন ব্যক্তি সরাসরি 60 কিলোগ্রাম ওজন তুলে ধরতে পারে, তবে পৃথিবীকে দণ্ডের সাহায্যে তুলে ধরতে (আর্কিমিডিসের বক্তব্য অনুযায়ী) যে দণ্ড লাগবে, সেই দণ্ডের বৃহত্তর অংশ ক্ষুদ্রতর অংশের তুলনায় লম্বায় 10^{23} গুণ বেশি হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, সমস্ত হিসাবগুলিই যেন কিরকম আমাদের ধারণার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

আর সময়? যদি ঐরকম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দণ্ডও যোগাড় করা গেল, তাহলে সেই দণ্ড দিয়ে পৃথিবীর সমপরিমাণ ভরের বস্তুকে এক সেন্টিমিটার উঁচুতে তুলতে, হিসাব করে দেখা গেছে যে, সময় লাগবে 3×10^{15} বৎসর। শুধু তাই নয়—এক সেন্টিমিটার ত' দূরের কথা, পৃথিবীকে মাত্র এক চুলের মত উঁচুতে তুলে ধরতে (ঐ প্রক্রিয়ায়) হলেও যে সময় লাগবে, সেই সময়ের মধ্যে মানুষের পক্ষে বেশ কয়েক পুরুষানুক্রমেও (generations) বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আবার কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যেও সময়ের ব্যাপ্তিকে খুব একটা হ্রাস করা যাবে না। কারণ বলবিদ্যার ধর্মানুসারে, ভারোত্তোলন দণ্ডের ব্যবহারে কিছু যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage) পাওয়া গেলেও, সঙ্গে সঙ্গে সময়েরও কিছু কিছু অপচয় অবশ্যই ঘটে। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম গতিশীল বস্তু আলোর গতিবেগেও যদি ঐ ভারোত্তোলন দণ্ডটিকে চালনা করাও হয়, তাহলেও আমাদের এই পৃথিবীকে এক চুলের মত উঁচুতে তুলে ধরতে সময় লাগবে প্রায় এক কোটি বছর।

সুতরাং, পৃথিবীকে সামান্য উঁচুতে তুলে ধরবার মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেও, আর্কিমিডিসের বক্তব্য ও দাবী যে কতটুকুমাত্র বাস্তবসম্মত হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে একটা অনুমান করতে পারা গেল। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, পৃথিবীকে কি সত্যিই তুলে ধরা সম্ভব?

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

লেসার রশ্মি

কৌশিক ভট্টাচার্য

'LASER' শব্দটি বস্তুতপক্ষে 'Light amplification by stimulated emission of radiation' এই কথাটির শব্দগুলির প্রথম অক্ষরগুলির সমষ্টিমাত্র। এই কথাটির বাংলা করলে দাঁড়ায় প্রকৃত বিকিরণের মাধ্যমে আলোকরশ্মির পরিবর্ধন। আজকের যুগে এই লেসার রশ্মির কথা অনেকেই আমরা শুনেছি। কিন্তু লেসার কি? এর বৈশিষ্ঠ্য, প্রয়োগপ্রতিরূপ সম্বন্ধে কোন ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই।

বৈশিষ্ঠ্য ঃ লেসার রশ্মির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হ'ল—সাধারণ আলোক রশ্মির মতো এরা উৎস থেকে নির্গমনের পর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে না এক বিশেষ দিকেই নির্গত হয়। সাধারণ আলোকের ক্ষেত্রে তাই আমরা আলোকিত বিরাট অংশের যেদিকে তাকাই সেদিকেই আলো দেখতে পাই। এ কারণে ঐ নির্দিষ্ট দিকে তাকালেই আমরা লেসার রশ্মিকে দেখি। এক্ষেত্রেও যে অন্যান্য আলোকের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে।

এতো হ'ল বৈশিষ্ঠ্য; এবার উৎপত্তি নিয়ে একটু আলোচলা করা যাক।

উৎপত্তি ঃ—কোন পরমাণুকে বাইরে থেকে শক্তির মাধ্যমে উত্তেজিত করে তুললে পরমাণু যেন তেন প্রকারেন সেই শক্তিকে যুক্ত করে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে চায় আর এই শক্তি যুক্ত হয় সর্বদাই বিকিরণের মাধ্যমে। তবে লেসার রশ্মির ক্ষেত্রে যেহেতু অতি তীব্র; সূক্ষ্ম এবং সুসঙ্গত আলোকরশ্মির প্রয়োজন তাই আরো উন্নত প্রথার প্রয়োজন। 1960 সালে Maiman প্রথম লেসার রশ্মির উৎপাদন করেছিলেন চুনীর একটি কেলাসের মাধ্যমে। এখন কঠিন কেলাস ছাড়াও বিভিন্ন গ্যাসের সাহায্যে এমন কি গ্যালিয়াম আরসেনাইড নামক অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের মাধ্যমেও লেসার রশ্মির উৎপত্তি সম্ভব হচ্ছে। ব্যবহৃত পদার্থের উপরই নির্ভর করে রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

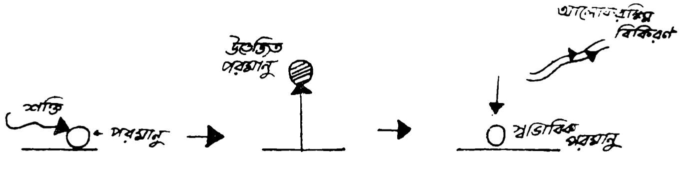

পরমানু থেকে আলোক রশ্মি বিকিরণ

আরো একটি প্রধান বৈশিষ্ঠ্য লেসার রশ্মির অসম্ভব তীব্রতা। পদার্থবিদ্‌রা দেখেছেন লেসার রশ্মি প্রতি স্পন্দনে এক মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি ঘনীভূত করে এজন্য লেসার রশ্মির দিকে তাকানো সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ যে কোন আলোই আমরা দেখি বিভিন্ন আলোর সমষ্টিমাত্র। যেমন—সূর্যালোক বা ফ্লুরোসেন্ট বাতি বা মোমবাতি শিখার আলো। কিন্তু লেসার রশ্মি সর্বদাই এক বিশুদ্ধ বর্ণের—তার কারণ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট। অনেক লেসার রশ্মি সাধারণ চোখে দেখা সম্ভব না হলেও আমরা পরীক্ষার মাধ্যাম জেনেছি তা এক বিশুদ্ধ বর্ণেরই।

তাছাড়া লেসার রশ্মি অধিক তীব্রতা সম্পন্ন এক একক কম্পাঙ্ক সৃষ্টিতে সক্ষম।

পঞ্চমতঃ বা শেষতঃ, এই আলোকতরঙ্গ সুসঙ্গত (Coherent) অর্থাৎ লেসার রশ্মি নির্গমনের পর যে বিকিরণ পৃষ্ঠের সর্বত্রই সমান কম্পাঙ্ক নিয়ে আপাতিত হয়।

ব্যবহার ও প্রয়োগবিধি ঃ লেসারকে 'সমস্যার সন্ধানে একটি সমাধান' বলা যেতে পারে। বহু ধরনের কাজেই আমরা লেসার কাজে লাগাতে পারি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ঃ লেসার রশ্মি যে অত্যন্ত তীব্রতা সম্পন্ন তা আগেই জেনেছি; চিকিৎসাশাস্ত্রেও লেসার রশ্মি এই গুণটির প্রয়োগে বহু কাজে আসতে পারে। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্রাদির পরিবর্তে সার্জেনরা লেসার রশ্মির মাধ্যমে অস্ত্রোপচারের কাজ সারতে পারেন। তাছাড়া লেসার রশ্মির মাধ্যমে অস্ত্রোপচার করলে রক্তপাতও কম হবে, কারণ লেসারের ছুরি যেখানে পড়বে সেখানে রক্তবাহী নালিকার রক্ত জমাট বেঁধে যাবে তাপের জন্য। অক্ষিপট বিচ্যুতি বা Retina detachment এর ফলে দৃষ্টিহানি হবার সম্ভাবনা হতে পারে। চক্ষু চিকিৎসকরা লেসার

(শেষাংশ 51 পৃষ্ঠায়)

ভূমিকম্প কি ও কেন?

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশিদিন আগের কথা নয়। তারিখটা 21 আগস্ট 1988। রবিবার, ছুটির দিন। পারিবারিক মিলনের দিন। কিন্তু সেই দিনটি নেপাল ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক অভিশপ্ত দিনে পরিণত হলো। কারণ সেদিন ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ উত্তর বিহার ও নেপালের এক বিরাট অঞ্চল কেঁপে উঠল প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সারা ভারতে ঘটে যাওয়া এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্পগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি অন্যতম। রিকটার স্কেল অনুযায়ী তীব্রতার মাপ 6·7। তাই ধ্বংসের প্রচণ্ডতা স্বাভাবিক কারণেই মাত্রাছাড়া। বিশেষত এই অঞ্চলে মানুষের বসবাস বেশি বলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশি। প্রায় এক মিনিট স্থায়ী এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (epicentre) ছিল দ্বারভাঙ্গা শহরের প্রায় 75 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে। তবে জায়গাটা গঙ্গার পলিমাটিতে ঢাকা। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে শুধু বিহার ও নেপাল নয়, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও পাশের বাংলাদেশের বহু অঞ্চলও কেঁপে উঠেছিল। এই ভূমিকম্পের ফলে অবশ্য সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে বিহারের দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, মধুবনী ও নালন্দা জেলায়। এই চারটি জেলায় অসংখ্য বাড়ি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। বহু জায়গায় ব্রিজ, রাস্তা ও নদীর বন্যা-নিরোধক উঁচু পাড় ভেঙে পড়েছে। রেল লাইন বেঁকে গেছে, বসে গেছে। অন্তত বেশ কয়েকশ গাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়ে পড়েছে মাটিতে। বেশ কিছু জায়গায় মাটিতে ফাটল তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসেছে ভূগর্ভের জল। পাটনার সত্তর বছরের পুরনো রাজভবনের দেয়ালেও বেশ বড় ফাটল তৈরি হয়েছে। তা'ছাড়া এই ভূমিকম্পে বিহার ও নেপালের প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতরভাবে আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে গেছেন বেশ কিছু মানুষ।

এই আগস্ট মাসেই (6 আগস্ট) ভোর ছ'টা নাগাদ আর একটি তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ভারতের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল। ফলে এই অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দু'মিনিট স্থায়ী এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিকটার স্কেলে 7·3। এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল শিলং শহরের 300 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। এই ভূমিকম্পের তীব্র কাঁপুনিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু জায়গায় রেললাইন বেঁকেছে, বসে গিয়েছে। অনেক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চুরমার। উৎপাটিত হয়েছে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক ও টেলিফোনের পোল। কংক্রিটের তৈরি কয়েকটা বাড়িতেও ফাটল ধরেছে। ভেঙ্গেছে জানলার কাচ। শিলচরের একটি হোটেল প্রায় এক মিটার বসে গেছে। গুয়াহাটি শহরের পলটন বাজার এলাকায়

মাটির ফাটল দিয়ে বেরোতে থাকে তেলের মতো পদার্থ। এই ভূমিকম্পের ফলে দিফু ও লামডিং রেল স্টেশনের মধ্যে বারলর্ডফারে বিরাট ধস নেমে আসে রেল লাইনের ওপর। তবে এই ভূমিকম্পে বেশ কিছু মানুষ আহত হলেও মৃতের সংখ্যা তেমন বেশি নয়।

পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির এই নির্মম নিষ্ঠুর খেলা আজ নতুন নয়। ভূমিকম্পের এই ধ্বংসলীলায় ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ ধনপ্রাণ হারিয়েছে নির্বিচারে, তবু প্রকৃতির রসনার তৃপ্তি মেটে নি। প্রতি বছর ভূমিকম্পের কবলে পড়ে প্রাণ হারান কত মানুষ? প্রায় দশ হাজার মানুষ। একটি হিসেব সে কথাই বলছে। পৃথিবীর বিগত কয়েকটি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন তা' বোঝা যাবে নিচের তালিকায় চোখ রাখলে।

দেশ	বছর	মৃত-মানুষ
কলকাতা (ভারত)	1737	3,00,000
তাংশান (চীন)	1976	2,40,000
শানসি (চীন)	1556	1,30,000
মেসিনা (ইতালি)	1908	1,00,000
কানসু (চীন)	1920	1,00,000
কানটো (জাপান)	1923	1,00,000
লিসবন (পরতুগাল)	1755	60,000
আরমেনিয়া (সোঃ রাশিয়া)	1988	58,000
লুয়ারাজ (পেরু)	1970	50,000
এল আসনাম (আলজিরিয়া)	1980	40,000
কোয়েটা (পাকিস্তান)	1935	25,000
কাংড়া (ভারত)	1905	20,000
মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো)	1985	20,000

ভূমিকম্প কাকে বলে? সহজ কথায় ভূমিকম্প মানে ভূমির কম্পন। অর্থাৎ ভূমি যখন কাঁপে, তখনই ভূমিকম্পের জন্ম। ভূমিকম্পে শিলাচ্যুতি ঘটে, ভূপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটল তৈরি হয়, পাহাড় থেকে ধস নেমে আসে, ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে নিচের জল বেরিয়ে আসে। মাটি থেকে উপড়ে আসে শিকড় শুদ্ধ গাছপালা, নদীতে মাছ মরে যায়, পাখিরা অস্বস্তিতে ভোগে, ভূগর্ভ থেকে নানা রকম আওয়াজ শোনা যায়। এমনি আরো কত কি! এতো গেল ভূমিকম্পের বাহ্যিক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে যে অগণিত মানুষ প্রাণ হারান, তার চেয়ে বেদনাময় ঘটনা আর কী ঘটতে পারে।

ভারতীয় ভূখণ্ডে স্মরণীয় কালের মধ্যে যেসব ভূমিকম্প হয়েছে, তার মধ্যে 1720 সালে দিল্লী ও 1737 সালে (11 অক্টোবর) কলকাতার ভূমিকম্পের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে। 1737 সালে 11 অক্টোবর (অথবা 30 সেপ্টেম্বর) রাতে বিরাট ঝড়ের সঙ্গে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গঙ্গাসাগর থেকে কলকাতার উত্তরে প্রায় নব্বই ক্রোশ (300 কিমি) দূরত্ব পর্যন্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপের এক বিরাট অঞ্চল খুবই আলোড়িত হয়েছিল। ভূমিকম্প ও ঝড়ের ফলে গঙ্গার জল প্রায় চল্লিশ ফিট উঁচু হয়ে এক বিরাট জায়গার মানুষজন ও পশুপ্রাণী ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি, সে সময় নাকি গঙ্গায় বহু নৌকো জাহাজ ধ্বংস হয়। মোট কুড়ি হাজার জলযান। তার মধ্যে ইংরেজদের আটখানা জাহাজ ছিল। সেসব জাহাজে নাকি ছিল প্রচুর সোনাদানা রত্ন।

1819 সালে (16 জুন) কচ্ছের ভূমিকম্পে প্রায় দু-তিন হাজার লোক মারা যায়। ভূমিকম্পের ফলে সিন্ধু নদের একটি শাখায় কৃত্রিম বাঁধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ভূমিকম্পের ভয়াবহতা

1988 সালের 7ই ডিসেম্বর বুধবার সোভিয়েত রাশিয়ার আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে গেল সে খবর এখন সকলেরই জানা। এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে প্রায় 8। আর্মেনিয়া আজ প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত, ধ্বংসস্তূপে পরিণত। চারিদিকে ঘর বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ ও সারি সারি মৃত মানুষের দেহ। কী বিভীষিকাময় দৃশ্য! প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কী করাল গ্রাস! এ দৃশ্য পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত হিরোসিমা নাগাসাকির কথা যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। আর্মেনিয়ার বৃহত্তম শহর লেনিনাকান ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। মৃতের সংখ্যা প্রায় 50 হাজার। গৃহহীন ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় 10 লক্ষ। প্রজাতন্ত্রের স্পিটাক ও রাজধানী শহর ইয়েরেকান প্রায় নিশ্চিহ্ন। আশ্চর্য, সোভিয়েত রাশিয়ার মত উন্নত প্রযুক্তি-শীল দেশের বিজ্ঞানীরাও এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারেন নি। বোঝা যায় এ ব্যাপারে এখনও প্রভূত গবেষণার অভাব রয়েছে।

শুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য

রসায়ন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

1897 সালের 12 জুন প্রচণ্ড ভূকম্পনের সৃষ্টি হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে। শিলং শহরের (এখন মেঘালয়ের রাজধানী) চারপাশে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রবল ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণহানি ও ধন-সম্পত্তির দারুণ ক্ষতি হয়েছিল। রিকটার স্কেলে এই ভূমি-কম্পের তীব্রতা ছিল 8·5। এই ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 8 কিলোমিটার নিচে 320 কিলোমিটার লম্বা একটি শিলাচ্যুতিকে।

1905 সালে হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার ভূমিকম্পে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

এরপর আসাম নয়, ভূমিকম্পের রোষ পড়ে নেপাল ও বিহারের ওপর। 1934 সালের 15ই জানুয়ারি বেলা সওয়া দু'টো নাগাদ বিহারের উত্তরাঞ্চল ও নেপালের দক্ষিণ ভাগ এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে উঠল। এই ভূমিকম্পে মতিহারি মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের জেলা ও কাঠমাণ্ডু অঞ্চলের দারুণ ক্ষতি হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বন্যার জল সমস্ত অঞ্চলটিকে প্লাবিত করে। কম করেও সেবার প্রায় 12 হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। রিকটার স্কেল অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 8·5। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পলিমাটির নিচে শক্ত পাথরে বিচ্যুতি ঘটবার ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

1930 সালে আসামের ধুবড়িতে ভূমিকম্পের পর 1935 সালের 31মে নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে বেলুচিস্থানের কোয়েটা ও কালাট (এখন অবশ্য পাকিস্তানের মধ্যে) ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দামামায় কেঁপে উঠল। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল 30 হাজার।

1937 (দেরাদুন) ও 1938 (সাতপুরা) সালের পর ভূমিকম্পের দামামা আবার বাজল আসামে। 1950 সালের 15 আগস্ট। স্বাধীনতার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব শেষ। সন্ধে 7-40 নাগাদ তৎকালীন আসাম রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এক ভীষণ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই প্রচণ্ড ছিল যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভূমিকম্প-মাপক কেন্দ্র থেকেই এই ভূকম্পন অনুভব করা গেছে। শুধু অনুভব করা নয়, এই ভয়ংকর ভূমিকম্পকে সবাই নানা বিশেষণে ভূষিত করেছে। 'ভয়ংকর, প্রচণ্ড, অভূতপূর্ব, ভয়াবহ' ইত্যাদি বিশেষণগুলি শুনলে বোঝা যায়, পৃথিবীতে এত প্রচণ্ড ভূমিকম্প এর আগে খুব কমই হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকম্প-বিশারদদের মতে, এটি পৃথিবীর পাঁচটি প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পের একটি। রিকটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা 8·5। পৃথিবীর ভয়ংকরতম অন্য চারটি ভূমিকম্প হলো আসাম (11 জুন 1897), লিসবন (1 নভেম্বর 1755), কানসু (চীন) (16 ডিসেম্বর 1920) ও বিহার-নেপালের ভূমিকম্প (15 জানুয়ারি 1934)। আসামের এই ভূমিকম্পে প্রায় 15,000 বর্গমাইল এলাকায় প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই এলাকার মধ্যে রয়েছে উত্তর লখিমপুর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, তিনসুকিয়া, সাদিয়া, শিবসাগর, মিশমি, আবর ইত্যাদি অঞ্চল। তখনকার দিনের হিসেবে প্রায় দশ কোটি টাকার ধনসম্পত্তি নষ্ট হলেও ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর সংখ্যা কম। এর কারণ সম্ভবত এই, মানুষ তখন সজাগ ছিল। ফলে নিরাপদ জায়গায় পালাতে তেমন অসুবিধে হয় নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি, ভূপৃষ্ঠের গভীরে শিলাচ্যুতির ফলে। ভূকম্পন-কেন্দ্রের সম্ভাব্য গভীরতা প্রায় 14 কিলোমিটার।

1967 সালের (11 ডিসেম্বর) এক ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে যায় পশ্চিম মহারাষ্ট্রের এক বিস্তৃত অঞ্চল। কয়নানগর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আশে পাশের সাতারা, সাংলি, কোলাপুর ও রত্নাগিরি জেলায় কম করেও এক হাজার গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের এই তাণ্ডব শুধু মহারাষ্ট্রের ওপরই আঘাত হানে নি, ফাটল ধরিয়েছে ভূবিজ্ঞানীদের চিরকালের বিশ্বাসের ভিতেও। প্রমাণ করেছে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলকে যতখানি অনড় মনে করা হতো, ততখানি অনড় সে নয়। কয়না 1980 (6 ফেব্রুয়ারি, কয়না), 1983 (30 ডিসেম্বর, গৌহাটি 1983 (30 জুন, হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ), 1983 (30 আগস্ট, শিলচর ও গৌহাটি), 1983 (30 ডিসেম্বর, গৌহাটি ও শিলং), 1983 (31 ডিসেম্বর, উত্তর-পশ্চিম ভারত), 1983 (25 জানুয়ারী, আন্দামান), 1984 (31 ডিসেম্বর, কাছাড়) 1986 (এপ্রিল, হিমাচল প্রদেশ), 1987 (18 মে, শিলচর ও শিলং)।

ভূমিকম্প কেন ? এই প্রশ্নটি বিচার-বিবেচনা করে ভূবিজ্ঞানীরা তিনটি প্রধান কারণের কথা বলেছেন।

ভূমিকম্প রোধ করা যায় কি ভাবে

বিজ্ঞানী এ. ই. এইচ লাভ সাহেবের কথায় বলা যায় পৃথিবীর কোন অংশে যখন ভূ কম্পন হয় এবং এই প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে যখন শিলাচ্যুতি ঘটে, তখনই শুরু হয় তরঙ্গের। শান্ত দীঘিতে ঢিল মারলে যেমন হয়, এই কম্পনও একই ভাবে ঢেউয়ের মতো চারিদিকে ছড়ায়। কম্পনের বিন্দু থেকে শুরু হয়, ছড়িয়ে যায় সমস্ত পাতাল পুরী।

এই তরঙ্গের মাত্রা যা পরিমাণ নির্ভর করে যেখানে এর কেন্দ্র বিন্দু সেখানকার শিলাস্তরের গুণগত মাণের উপর যেমন একটা গীটারের সবগুলো তারেই কিন্তু একই ধরণের আওয়াজ হয় না। কোন তারে মোটা বা কোনটায় মিষ্টি মিহি আওয়াজ। এটা হয় তারের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে ! কোন তার কতো মোটা কোন তার কতো সরু, কোনটা কোন ধাতু দিয়ে গড়া, এ সবের উপর নির্ভর করেই আওয়াজের হেরফের হয়।

পৃথিবীর ভূগর্ভের কম্পনের পরিমাণ ও শিলার মানের উপর নির্ভর করে। যেখানে কম্পনের কেন্দ্র বিন্দু হবে, সেখানকার শিলা যতো ঘন ও কঠিন হবে, কম্পনও ততো তীব্র আর দ্রুত হবে।

এই কম্পন কতো দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়তে পারে ? এটাও নির্ভর করে শিলার কঠিনতার উপর, তবে সাধারণ ভাবে এই ভূ-গর্ভের কম্পন তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার গতিবেগ হলো তিন মিনিটে এক হাজার মাইল। (এক হাজার ছয়শো দশ কিলোমিটার) এটাই ছিল লাভ সাহেবের সূত্রের মূল কথা।

কিন্তু এই সূত্র অনেক দিন আগে আবিষ্কার হলেও এর তেমন প্রচার বা প্রসার হয়নি। এটা প্রায় অজানাই ছিল মানুষের কাছে। এমন কি বিজ্ঞানীদের কাছেও !

তারপর অনেক দিন হয়ে গেছে। প্রতিদিনের কতো ঘটনা ঘটে গেছে। এমনি করে একদিন লাভের সূত্রটাও মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। না, শুধু মাত্র একজন, নাম ডাঃ হুগো বেনিয়ফ। লাভের সূত্র ধরে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে তিনি এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। ডাঃ হুগো বেনিয়ফ ছিলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রফেসর, তিনি যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটি দিয়ে ভূ-গর্ভের একেবারে সামান্যতম স্পন্দনও ধরা যায়।

জহর মুখোপাধ্যায়

ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাপ ও কেন্দ্রের গভীরতা নিয়ে ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে। সাধারণভাবে তীব্রতার পরিমাণ রিকটার স্কেল অনুযায়ী 6·5 থেকে 7·5-এর মধ্যে। ভূকম্পনকেন্দ্রের গভীরতা থেকে 30 কিলো-মিটার পর্যন্ত।

ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে পরবর্তী সময়ে আর যেসব ভূমিকম্প হয়েছে, তার মধ্যে যা মোটামুটি ভাবে উল্লেখযোগ্য, তা, হলো ঃ 1975 (19 জানুয়ারি, হিমাচল প্রদেশ), 1979 (5 আগস্ট, ওড়িশা), 1979 (22 ডিসেম্বর, শিলং),

এক ঃ ভূপৃষ্ঠ-জনিত কারণ ঃ পাহাড়ী অঞ্চলে ধস নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, 1811 সালে তুর্কিস্থানের ভূমিকম্পে পামীর উপত্যকা অঞ্চলে 50 হাজার কোটি টন ওজনের বিশাল ধস (landslide) পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিরাট ধস নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প।

দুই ঃ আগ্নেয়গিরি-জনিত কারণ ঃ ভূবিজ্ঞানীদের

(শেষাংশ 66 পৃষ্ঠায়)

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
মেজ্কগ !
?!
আরে, খুদে ওটা কি রকম সাইকেল ? ভারি অদ্ভুত তো !
মেজকো সরে যাও !
হতভাগাটা যে ভাবে গণ্ডারের মতো ছুটে আসছে— একটা এ্যাকসিডেন্ট না ঘটিয়ে ছাড়বে না !
এ্যাই এ্যাই থাম্ !
ধরেছি !
ইয়াঃ !

এ সব কি হচ্ছে? আর একটু হলেই তো অবস্থা ঘোলা হয়ে যেতো!
একটা ভাল কাজের জন্য জান যায় তো কুছ পরোয়া নেই। কিন্তু তুমি আমার এ কি করলে?
ভাল কাজ! একটা কিম্ভুত কিম্মাকার সাইকেলে তুই কি ভাল কাজ করতে যাচ্ছিলি শুনি?
কাজ নয় এক্সপেরিমেন্ট চলাচ্ছিলাম। মডার্ন টেকনলজির সাহায্যে আমি এই নিউ সুপার ফার্স্ট সাইকেলটার উদ্ভাবন করেছি। মাঝখান থেকে তুমি এসে সব ভেস্তে দিলে!
সুপার ফাস্ট তাও আবার সাইকেল! ফুঃ, এ দুর্বুদ্ধি তোকে কে দিল?
দেবে আবার কে? সব এই ব্রেন খাটিয়ে। এতে আছে একটা প্রপেলার, একটা ট্রিপ্‌ল গিয়ার আর—
ব্যাস রেকর্ড ব্রেক?
না না, এখানেই শেষ নয়। নয়। আমার সাইকেল একটা সুপার ফার্স্ট ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দেবে, কিন্তু নো পেট্রল নো ডিজেল। খালি ম্যানুয়েল লেবার।
সুপার ফার্স্ট ফুঃ ওতো নামেতেই। আজকাল এর চেয়েও সুপার সুপার গতি সম্পন্ন যান আবিষ্কার হয়ে গেছে চাঁদু।
তা ঠিক। তবে আমারও অ্যাম্বিশান থেমে থাকবে না।

তোর অ্যাম্বিশনের সঙ্গে বুদ্ধিতে একটু শান্ দেওয়া দরকার খুদে। গতি সম্বন্ধে তোর সঠিক কোনো ধারণাই নেই।
দুশো-পাঁচশ-হাজার একটা গতি হল?
আমি তাহলে একে সুপার সনিক মানে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী করবো।
আলোর গতির কাছে শব্দের গতি দুগ্ধপোষ্য।
আলোর গতি সেকেণ্ডে দুই লক্ষ সাতানব্বুই হাজার ইশ কিলোমিটার। কিন্তু এই গতিতে চলার মতো কোন কিছু এখনও বের হয়নি।
তা ঠিক। একমাত্র বিশাল দূরত্ব মাপার ক্ষেত্রে, যেখানে মাইল কিলো-মিটার অচল সেখানে এই আলোর গতি ব্যবহার হয়।
জানি। একে বলে লাইট্ ইয়ার- আলোকবর্ষ।
এ আলোর চেয়েও দ্রুতগামী আর একটা জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে; জানিস কি?
জিনিস! তা জিনিসটা কি তোমার আবিষ্কার?
তুই একটা ছাগল! জিনিসটা এক আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানী-ডক্টর জেরাল্ড ফেনবার্গ আবিষ্কার করেছেন এবং এটা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে।
জিনিসটা হচ্ছে এক প্রকার কণিকা। এর নাম ট্যাকিওন। সাধারণ বস্তুর গতি যেখানে শেষ, ট্যাকিওনের গতি সেখান থেকেই শুরু।
বাপরে! এতে একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে!
এই ট্যাকিওন আবিষ্কার হলে হয়ত দেখবি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তত্ত্বই পাল্টে যাবে। তখন গ্রহান্তরের দূরত্ব মাপা হবে এই ট্যাকিওন দিয়েই।
তার মানে আলোর গতিও তখন এর কাছে নস্যি হয়ে যাবে?
প্রথমে ছিল আলো তারপর এল কণা। এতে গাড়ি ঘোড়ার কোনো সুবিধা হবে না, খালি দূরত্ব মাপা হবে! বোঝ ঠ্যালা! যাতোসব আজগুবী কাণ্ড!

আরে, একি হলো!
ঝপাং
একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলুম, কোত্থেকে মূর্তিমান এসে সব দিয়ে সব বানচাল করে দিলে! দাঁড়াও গতি কাকে বলে দেখাচ্ছি!
রাসকেল!
এত শোনার পরও ঐ কিম্ভুত জিনিসটা আবার তুলেছে!
তুই কি ভেবেছিস এটা দিয়ে ট্যাকিওনের সঙ্গে পাল্লা দিবি? হাঃ-হাঃ-হাঃ-!
দেখই না, কার সঙ্গে পাল্লা দি।
এ্যাই, ও-ওটা কি হচ্ছে?
কিম্ভুতকিমাকারটা দেখছি আমার দিকেই চালিয়ে দিয়েছে! খুদে. এ-এটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, খুদে!
এ্যাই এ্যাই, থাম বলছি! শেষকালে কোথায় লেগে-টেগে যাবে—
মেজদ্কা, তুমি তোমার স্পীড ক্রমশ বাড়িয়ে যাও-তাহলে কিছু হবে না। আমি খালি এর স্পীডটা টেস্ট করে নেবো।
ওরে আমি স্বীকার করছি তোর গাড়িরই স্পীড বেশী। এখন তোর স্পীড টেস্ট থামা খুদে!
যাক, খুব হয়েছে! এখন নিশ্চিন্তে আমি আমার গবেষণা চালাতে পারবো।
এখন মেজদ্কার স্পীড বোধহয় ট্যাকিওনকেও ছাড়িয়ে যাবে!

কুইনাইন

সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক উদ্ভিজ্জ ভেষজ

নুরুররহমান জাহাঙ্গীর

ম্যালেরিয়া জ্বরের সফল চিকিৎসায় সক্ষম সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিজ্জ ভেষজের নাম কুইনাইন। কুইনাইন সিঙ্কোনা গাছের বাকল সম্ভূত উপক্ষার বিশেষ। এক সময়ে নানা বাস্তব কারণে আমরা কুইনাইনের কথা ভুলতে বসেছিলাম। সুলভ ও অধিকতর নিরাপদ সংশ্লেষিত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধের আবির্ভাবের ফলে কুইনাইনের স্থানটি প্রায় বেদখল হবার যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সংশ্লেষিত ওই সব ঔষধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া পরজীবির আবির্ভাব হওয়ায় এখন আবার ডাক পড়েছে পুরনো সেই কুইনাইনের। জটিল ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া নিরাময়ে কুইনাইন আবার চিকিৎসকদের শেষ ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কার্যকরী আরো দু-একটি উদ্ভিজ্জ ভেষজ ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে তবে সেগুলো এখনো কুইনাইনের মতো সুদীর্ঘ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৌশলের কল্যাণে বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় প্রাচীন উদ্ভিজ্জ ভেষজের স্থানটি যখন নতুন নতুন সংশ্লেষিত ঔষধ অবলীলায় দখল করে নিচ্ছে, তখন কুইনাইনের ব্যবহার শুরু হবার দীর্ঘ 350 বৎসর পরেও তা টিঁকে আছে বিপুল বিক্রমে।

কবে কোন প্রাগৈতিহাসিক কালে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তার সঠিক হদিশ কারো জানা নেই। উইলিয়ামস্ ম্যালেরিয়াকে প্রকৃতির নিজস্ব যন্ত্রনা দানের যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিয়োজিত ম্যালেরিয়া কমিশনের হিসেব মতে প্রাচীন গ্রীসের সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছিল। উইলিয়ামসের মতে গ্রীক সভ্যতার পতনের ক্ষেত্রেও তা অবদান রেখেছিল। রোমের পতনের জন্য যে সব কারণকে চিহ্নিত করা হয় তাদের মধ্যে প্লেগ ও ম্যালেরিয়াও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের অসুখ হলেও এই পৃথিবী বহুবার ম্যালেরিয়ার বিশ্ব মড়ক প্রত্যক্ষ করেছে আর তাতে মৃত্যু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। অচল ও অসুস্থ জীবনের শিকার হয়েছে আরো সহস্র লক্ষ মানুষ। আজো এর মারণযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে।

কুইনাইন আবিষ্কৃত হবার আগে ম্যালেরিয়া জ্বরের কোন কার্যকর চিকিৎসা ছিল না। জ্যোতিষবিদ্যা, জাদুমন্ত্র, মাদুলি কবচ, রক্তমোক্ষন, বিরেচন, ধর্মীয় আচার এর সবই ম্যালেরিয়া নিরাময়ে অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। ন্যূন্যাধিক তিনশ বছর ব্যাপী প্রথমে সিঙ্কোনা বাকলের গুড়ো এবং পরে সেই বাকল থেকে পৃথকীকৃত উপক্ষার কুইনাইন এবং ম্যালেরিয়ার ইতিহাস একই সূত্রে গাথা ছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ গবেষণাগারে সংশ্লেষিত ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কারে সক্ষম হয়। তবে সে সব ঔষধের সীমাবদ্ধতার কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

1633 সালে ইয়োরোপীয়রা প্রথম সিঙ্কোনা বাকলের কার্যকারীতার সন্ধান পায়। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেজ এলাকার গুল্ম-চিকিৎসকদের কাছ থেকেই সম্ভবতঃ সিঙ্কোনা বাকলের গুণাবলীর কথা স্পেনীয় মিশনারীরা জানতে পারে। সপ্তদশ শতকে কার্ডিনাল জুয়ান-ডিলুগো স্পেনে প্রথম সিংকোনার ব্যবহার প্রচলন করেন। পরে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

কুইনাইন ভেষজের উপাদান—সিঙ্কোনা

অবশ্য ম্যালেরিয়া নিরাময়ে সিংকোনা বাকলের গ্রহণ যোগ্যতা নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। নানা প্রজাতির সিংকোনা গাছের বাকলের গুড়ো চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হত। এদের কুইনাইন মাত্রার অসমতার

কারণে ফলও হত বিভিন্ন, আবার সব ধরনের জ্বরেই এর নির্বিচার প্রয়োগ হত। তদুপরি ক্যাথলিক চার্চের অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়ায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতের চিকিৎসকরা এই বাকল ব্যবহার করতেন না। ফলে সিংকোনার ব্যাপক ব্যবহার শুরুতেই বাধাগ্রস্থ হয়।

1672 সালে শিক্ষানবীশ এক ঔষধ বিক্রেতা রবার্ট ট্যালবুর সিংকোনা বাকলের এক গোপন মিশ্রণের সাহায্যে বিলেতের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়া জ্বর নিরাময়ে সক্ষম হন। পুরস্কার হিসেবে ট্যালবুর নাইট উপাধি এবং রাজকীয় চিকিৎসকের পদটি পেয়ে যান আর সে সময় থেকে সিংকোনা বাকলও বিলেতে স্বীকৃতি ও সমাদর পেতে থাকে।

1742 সালে বিখ্যাত সুইডিস প্রকৃতিবিদ কার্ল লিনেয়াস বিখ্যাত এই গাছের প্রথম বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনিই এই গাছের সিংকোনা নামকরণ করেন। এই গাছের বাকলের সহায়তায় পেরুর ভাইসরয়-পত্নী লেডি সিংকোনের আরোগ্যের কাহিনীই এই নামকরণের উৎস রূপে বিবেচিত হয়। লিনেয়াসের মতে সিংকোনা রুবিয়েসি গোত্রের উদ্ভিদ। দক্ষিণ আমেরিকার কলাম্বিয়া থেকে পেরু পর্যন্ত আন্দেজের শীতল মেঘাবৃত বনের স্থানীয় উদ্ভিদ। সিংকোনার প্রায় 40টি প্রজাতি আছে। এই গাছে মাখন-সাদা গোলাপী রংয়ের ছোট ছোট ফুলও ধরে।

সিংকোনার ব্যবহার ও চাহিদা বাড়বার সাথে সাথে এই গাছের খোঁজে নতুন পৃথিবীর দুর্গম অঞ্চলে বহু অভিযান বের হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী রসায়নবিদ পেলেটিয়ার ও ক্যাভেনটু সিংকোনা বাকল থেকে কুইনাইন সিংকোনাইন নামের দুটি আলাদা উপক্ষার পৃথক করেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সিংকোনা গাছ চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়। বৃটিশ অধিকৃত ভারত, সিংহল এবং ওলন্দাজ অধিকৃত ইন্দোনেশিয়ায় সিংকোনার বাগান গড়ে তোলা হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাভাতেই সবচেয়ে উন্নত মানের বাকল উৎপাদনকারী সিংকোনাগাছের বিশাল বাগান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে নিলে মিত্রশক্তি বাধ্য হয়ে সংশ্লেষিত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য জার্মানরাই প্রথম এই উদ্যোগ নিয়েছিল এবং 1930 সালে সর্বপ্রথম সংশ্লেষিত ম্যালেরিয়ার ঔষধ মেপাক্রিন আবিষ্কার করেছিল। 1943-44 সাল ব্যাপী মিত্রশক্তির দেশগুলোতে ব্যাপক আকারে মেপাক্রিন তৈরী হতে থাকে। এই ঔষধটি হাজার হাজার সৈন্যকে যুদ্ধোপযোগী রাখতে সহায়তা করে এবং নাজী আগ্রাসন ঠেকাতে সহায়তা করে বিশ্ব ইতিহাসের করুণ পরিণতি রোধে অবদান রাখে।

বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় 5 থেকে 10 হাজার টন সিংকোনা বাকল এবং সেগুলো থেকে 35 থেকে 40 হাজার কিলো কুইনাইন তৈরী হয়। এর সবটা কিন্তু ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না। 30 থেকে 50 ভাগ কুইনাইনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কুইনিডাইনে পরিবর্তিত করা হয়। কুইনিডাইন জটিল হৃদরোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে শতকরা 40 ভাগ কুইনাইন যায় খাদ্য ও ঔষধ শিল্পে। সেখানে তিক্তকারী উপাদান হিসেবে কুইনাইন ব্যবহৃত হয়।

সে সব কারণে বিজ্ঞানীরা কুইনাইনের পরিবর্তে সংশ্লেষিত ম্যালেরিয়া নিরাময়কারী ঔষধ ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়েছিলো সেগুলো হল (1) কুইনাইনের যুদ্ধকালীন সরবরাহ সমস্যা, (2) সহজ প্রাপ্যতা ও সুলভ মূল্য (3) নতুন ঔষধের স্বল্প পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও নিরাপত্তা।

মানব দেহে কুইনাইন প্রয়োগ করলে তা শুধু যে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধেই কাজ করে তা নয়, দেহের ওপর তা আরো বহুবিধ প্রভাব ফেলে। এ সব প্রভাবের কোন চিকিৎসাগত ভূমিকা নেই। তদুপরি কুইনাইনের আরো বিষাক্ত প্রভাবও রয়েছে। সেদিক থেকে সংশ্লেষিত ঔষধগুলো অনেক বেশি নিরাপদ।

কিন্তু নিরাপদ হলে কি হবে, এই সব ঔষধ আজকাল জটিল ধরনের ম্যালেরিয়া নিরাময় করতে পারছে না। ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কুইনাইনের সাম্প্রতিক ব্যবহার প্রমাণ করেছে যে, আমরা এখনো একটি আদর্শ ও সর্বগুণান্বিত ম্যালেরিয়া নিরাময়কারী ঔষধ আবিষ্কারে সক্ষ হইনি। অবশ্য ইতিমধ্যে আর্টেমেসিয়া অ্যানুয়া নামের একটি উদ্ভিদ এবং সিমারোবেসি গোত্রের গুল্মে প্রতিশ্রুতি-শীল ম্যালেরিয়া নিরাময়কারী ভেষজের সন্ধান পাওয়া গেছে।

মানব প্রজাতির ধারাবাহিক ইতিহাসে ম্যালেরিয়ার বিধ্বংসী প্রভাবের কথাটি যদি আমরা কিছুটাও অবগত থাকি তাহলে এই উদ্ভিজ্জ ভেষজটির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা আমরা কখনোই বিস্মৃত হব না। এমন কি যদি নিকট ভবিষ্যতে আরো আধুনিক কোন ম্যালেরিয়া নিরাময়কারী ভেষজ আবিষ্কার বা সংশ্লেষণ সম্ভব হয়, কিংবা যদি মানব জাতির সম্মিলিত প্রয়াসে গুটি বসন্তের মত ম্যালেরিয়াকেও বিশ্ব থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলেও কুইনাইনের সুনির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকাটি থাকবে চির অম্লান।

রহমত বিল্ডিং 155-157 সদরঘাট সড়ক, চট্টগ্রাম 4000 বাংলাদেশ

রাজরোগ যক্ষ্মা

আশিস মান্না

মাত্র একুশ বছর বয়সে চলে গিয়েছিলেন কবি সুকান্ত—যাদবপুর টিবি হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে শুয়েও যিনি লিখে গেছেন—

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
প্রাণপণে পৃথিবীর সবার জঞ্জাল,
পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

অনেক জঞ্জাল সরে গেলেও যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস (সংক্ষেপে টিবি)-এর প্রভাব এখনো সরানো সম্ভব হয় নি আমাদের দেশ থেকে। যদিও ঠিকমত চিকিৎসা করালে এ রোগে এখন আর কেউ মরে না, তবুও টিবি হয়, আট বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ—সবারই হয়।

কেন হয়? টিবির জন্য দায়ী এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া (ব্যাসিলাস) নাম **মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস**। **মাইকোব্যাকটেরিয়াম বোভিস** নামে আর এক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াও যক্ষ্মা ঘটাতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়া কেবল ফুসফুস নয়, অন্ত্র, অস্থি, লসিকাগ্রন্থি, বৃক্ক, প্লুরা পেরিটোনিয়াম, মেনিনজেস প্রভৃতিকেও আক্রমণ করে।

ভারতের জনস্বাস্থ্যে টিবি একটি বিরাট সমস্যা। প্রতি বছর প্রায় পাঁচলক্ষ লোক মারা যায় এই রোগে। অবশ্য এই হার এখন কমের দিকে, কারণ এক লক্ষ জন পিছু টিবিতে মৃতের সংখ্যা 1920 সালে ছিল 400, 1950 সালে ছিল 200, 1964 সালে 100 এবং 1978 সালে প্রায় 60। তবুও বর্তমানে ভারতে প্রায় এক কোটি লোক টিবিতে আক্রান্ত।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় টিবি ব্যাসিলাস শরীরে প্রবেশ করলেই টিবি হয় না। রোগের বহিঃপ্রকাশ নির্ভর করে কতকগুলি শর্তের ওপর, যেমন শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা (প্রকৃতিগত ও অর্জিত), বয়স (45 বছরের ওপর টিবি বেশী হয়) পুরুষ না মহিলা, (পুরুষদের টিবির হার মহিলাদের প্রায় তিনগুণ), আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও বিভিন্ন রোগের উপস্থিতি (ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস, হৃৎপিণ্ডের রোগ ইত্যাদি)।

এই ব্যাসিলাস শরীরে (বিশেষত ফুসফুসে) প্রবেশ করে নাক বা মুখ দিয়ে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর কাশির মাধ্যমে সূক্ষ্ম কণার আকারে প্রবেশ করে, যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত গরুর দুধ ঠিকমত ফুটিয়ে না খেলেও টিবিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে বলে কামেট (Calmette) মনে করেন। এরপর ব্যাসিলাস ছোট ছোট আণুবীক্ষণিক কলোনী তৈরী করে—তার মধ্যে থাকে জীবন্ত ব্যাসিলাস, আবরণীকল্পকলা কোষ (epitheloid cells), লিম্ফোসাইট, ফাইব্রোব্লাস্ট—প্রভৃতি। এরকম এক একটি কলোনীকে বলা হয় টিউবারকল—যার থেকে টিউবারকুলোসিস নামটি এসেছে। এই অবস্থায় রোগের বহিঃপ্রকাশ ছাড়াই বছরের পর বছর থাকতে পারে।

অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়াগুলি তীব্র ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাশি, বুকে ব্যথা, মাথাঘোরা, ঝিমুনি, খিদে কমে যাওয়া, ওজন হ্রাস, রক্তাল্পতা, রাত্রে ঘাম দেওয়া, অল্প অল্প জ্বর ইত্যাদি হল এই রোগের প্রাথমিক উপসর্গ। এরপর ব্যাসিলাস ফুসফুসের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে আক্রমণ করে; ফলে রক্তজালক ফেটে পড়ে অ্যালভিওলাসের মধ্যে তখনই কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে (Haemoptysis), লসিকাবাহের মাধ্যমেও ব্যাসিলাস ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন লসিকা গ্রন্থিতে (Lyemoptysis)। ফলে লিম্ফ নোডগুলি ফুলে ওঠে।

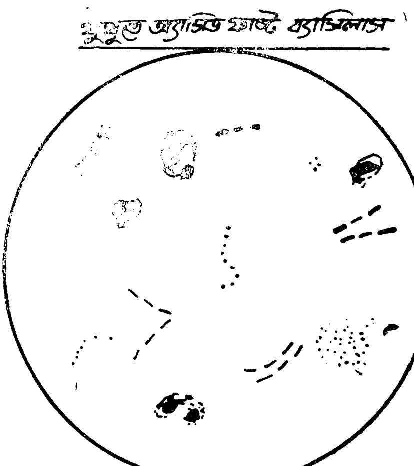

থুথুর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করে টিবির ডায়াগনোসিস করা হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে রং করে অ্যাসিড ফাস্ট

ব্যাসিলাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন অভিজ্ঞ প্যাথলজিস্টরা। এছাড়াও টিউবারকুলিন বা মান্টু, (Mantoux) টেস্ট, এক্স-রে প্রভৃতির সাহায্যে টিবি নির্ণয় করা যায়। বিজ্ঞান সম্মত না হলেও থেরাপিউটিক ডায়াগনোসিস অর্থাৎ ওষুধের ফলাফল দেখে রোগ নির্ণয়ও হচ্ছে আমাদের দেশে। এক্ষেত্রে E.S.R. বা এরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশান রেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারন E.S.R-ই রোগটির অগ্রগতির অবস্থার (Prognosis) সঠিক ধারণা দিতে পারে। এগুলির ভেতর ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে থুথু পরীক্ষার ওপর, তার পেছনে আছে পরীক্ষাটির সারল্য, অল্প ব্যয়, সহজলভ্যতা, দ্রুততা, সবার ওপর নির্ভর-যোগ্যতা এক্সরে বা রেডিওগ্রাফির খরচ ও প্লেট দেখে রোগ নির্ধারণের নির্ভরশীলতার অভাব এই পদ্ধতিকে সাধারণের কাছ থেকে দূরে রেখেছে। আর টিউবারকুলিন টেস্ট আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, যক্ষ্মার টীকা দিলেও এই টেস্ট ধনাত্মক (Positive) হয়।

রোগ নির্ণয়ের পর চিকিৎসা। যক্ষ্মার চিকিৎসা করা হয় অ্যান্টি টিউবারকুলোসিস ড্রাগ (সংক্ষেপে A. T. Drugs)। সাধারণতঃ দুধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়— ব্যাকটেরিয়া বিনষ্টকারী (Bacteriocidol) এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহতকারী (Bacteriostatic)। ব্যাকটেরিওসাইডাল ড্রাগের মধ্যে পড়ে আইসোনিকো-টিনামাইড হাইড্রাজাইড (INH), রিফামপিসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, পাইরাজিনামাইড, ইথিওনামাইড, প্রভৃতি, অপর পক্ষে ব্যাকটিরিওস্ট্যাটিক ড্রাগ হল প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড (P. A. S.), থায়ো অ্যাসিটাজোন, ইথামবুটল. সাইক্লোসেরিন প্রভৃতি। অবশ্য এই সমস্ত ওষুধই এক সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না, বিভিন্ন মিশ্রণ (Combination) আলাদা আলাদা ভাবে নানা পদ্ধতিতে (Regimen) ব্যবহৃত হয়। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ভিটামিনের অভাব মেটাতে মাল্টিভিটামিন দেওয়া হয়।

আগে টিবির চিকিৎসা করা হত রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে সেখানে বেশ কিছুদিন রেখে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা। কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল, সেই সংগে রোগীর ওপর মানসিক চাপও পড়ে বেশী। তাই বর্তমানে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা হয়— কেবলমাত্র আনুষঙ্গিক জটিলতা থাকলেই যক্ষ্মা রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া উচিত। আর যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ে রোগ নির্ণয়ের আগে, ফলে রোগ সংক্রমণও সংখ্যায় আর তেমন বাড়তে পারে না। সাধারণতঃ 18 থেকে 24 মাস অবধি চিকিৎসা করান হয়, তবে বর্তমানে 6 থেকে 9 মাস ব্যাপী 'সর্ট কোর্স থেরাপি' অধিক প্রচলিত।

টিবির প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বি. সি. জি ভ্যাকসিন। 1907—1925 সাল পর্যন্ত প্যারিসে গবেষণা করে কামেট ও গুয়েরিন (Guerin) এক নূতন ধরণের ব্যাসিলাস স্ট্রেন (Strain) তৈরী করেন—যা মানব দেহে অ্যান্টিবডি তৈরী করে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে, অথচ রোগ ঘটায় না। এঁদেরই নামানুসারে ব্যাসিলাসটির নাম হয় ব্যাসিলাস কামেট গুয়েরিন (ECG)। 1927 সালে প্যারিসে প্রথম একটি মানবশিশুকে বি. সি. জি. ভ্যাকসিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। 1948 সাল নাগাদ সারা পৃথিবীর চিকিৎসকেরা বি. সি. জি ভ্যাকসিনকে টিবি প্রতিরোধে টিকা হিসাবে মেনে নেন। মাদ্রাজের "যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্রে" (Tuberculosis Chemetherapp Centre, Madras) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃত 'ড্যানিশ 1331'স্ট্রেনটি ব্যবহার করে, এই স্ট্রেনটিকে তৈরী করা হচ্ছে কামেট কর্তৃক উদ্ভাবিত সেই ব্যাসিলাসের "বংশধর" থেকে। কোপেন হেগেনের ইন্টার-ন্যাশনাল রেফারেন্স সেন্টার ফর বি. সি. জি কোয়ালিটি কণ্ট্রোল সর্বদা টিকার গুণাগুণ পরীক্ষা করে থাকে।

ভারত সরকারের নীতি অনুসারে এই টিকা। 1 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের বিশেষ ধরণের "টিউবারকুলিনে সিরিঞ্জ")-এ করে চামড়ার ঠিক নীচে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বাঁ হাতের ডেলটয়েড় পেশীর ওপরের জায়গাটাই বেছে নেওয়া হয়। দু-তিন সপ্তাহ ধরে জায়গাটা একটু ফুলে থাকে, ছোট ঘায়ের মতনও হয়ে যেতে পারে। আট থেকে চোদ্দ সপ্তাহের মধ্যে তা সেরে যায় এবং তখনই বাচ্চার দেহে টিবির অ্যান্টিবডি তৈরী সম্পূর্ণ হয়, ফলে শিশুটি টিবি প্রতিরোধ করতে পারে। এর সাফল্য সম্পর্কে যদিও কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে, তবুও এটিকে WHO-র Expanded Programme on Immunization-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, ভারতের "জাতীয় যক্ষ্মা প্রকল্প" (National Tuberculosis Programme)-এ তো বটেই।

ভারত সরকার যথেষ্ট গুরুত্বের সংগে যক্ষ্মা রোগ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, বিশদফা কর্মসূচীতে 'যক্ষ্মা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তি তার প্রমাণ। জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্ট টিবি সেন্টার (DTC গঠন ও জেলা টিবি অফিসার (DTO) নিয়োগ এবং রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও টিকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু ভারত নয়, অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের কাছেও এই রোগ এক করাল সমস্যা। এই ধরণের পদক্ষেপের ফলেই তাকে ধীরে ধীরে নির্মূল করা সম্ভব।

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল,
স্টুডেন্টস হোস্টেল, কলকাতা-14

বোর্নিওর বেজী

সঙ্কর্ষণ রায়

[দুই]

মাদ্রাজের কাছে সমুদ্রের ধারে গোল্ডেন বিচে (Golden Beach) একটি বহুতল বাড়ির তিন তলায় পুরুষোত্তম প্যাটেলের ফ্ল্যাট। উল্টোদিকের ব্লকের তিন তলায় পুরুষোত্তমের মুখোমুখী লীলাবতী রঙ্গনাথনের ফ্ল্যাট। ডক্টর সুবীর সিংহ ফোরেনসিক্ বিজ্ঞানী। কলকাতার বিখ্যাত ফোরেনসিক বিজ্ঞানী ডক্টর কল্যাণ বসুর সহকারী সে। কল্যাণ বসুর মূল গবেষণা-কেন্দ্রের শাখা গড়ে তুলেছে সে গোল্ডেন বিচ্-এর একটি বাগান বাড়িতে। তার সঙ্গে আছে তার স্ত্রী করবী। করবী ডক্টর বসুর মেয়ে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট পাওয়ার পর সেও গবেষণাগারের কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

পুরুষোত্তমের হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের কর্তৃপক্ষের ডাক পেয়েই পুরুষোত্তমের ফ্ল্যাটে এসেছিল সুবীর। করবীও এসেছিল তার সঙ্গে। সুবীরকে সাহায্য করতে এসেছিল সে, কিন্তু পুরুষোত্তমের ক্ষত বিক্ষত মৃত দেহটির দিকে সে তাকাতেই পারছিল না। ভয়ে প্রায় নেতিয়ে পড়েছিল সে। তার অবস্থা দেখে তাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছেন লীলাবতী।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'মিসেস সিন্‌হার এই ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক পুরুষোত্তমের মৃতদেহটির চেয়ে বীভৎস কিছুই নেই এ পৃথিবীতে।'

'বীভৎস কাকে বলছেন!' সুবীর গম্ভীর মুখে বললে, ডেড্-বডি ইজ্ ডেড্-বডি (Dead body is dead body) খুবই হার্মলেস্ জিনিস। সর্বাঙ্গে রক্তমাখা, যেন রক্তের পোশাক প'রে আছে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে ধুলো বালি। স্লাইডে তুলে নিচ্ছি...'

'তুলুন, পরীক্ষা করুন, কিন্তু খুনী, এই কোদাভতি ঘণ্টি বীর বরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ মূর্তি।' ভেঙ্কটরাজন বললেন।

'এই দেখুন মিস্টার ভেঙ্কটরাজন। হটাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল সুবীর, 'একটি রক্ত মাখা ক্ষুর। ডেড্ বডির পাশেই প'ড়ে আছে।'

ক্ষুরটি তুলে নিয়ে ভেংকটরাজন বললেন, ওহে নৃসিংহ অবতার, এই ক্ষুর দিয়েই তো মেরেছ তুমি তোমার বন্ধুকে!

বুঝলেন ডক্টর সিন্‌হা, নরসিংহ মূর্তির হাতের আঙ্গুলের, ছাপ এই ক্ষুরের হাতলে পেয়ে যেতে পারেন!

'না পাবেন না!' নরসিংহমূর্তি আর্তস্বরে বললে, 'ঐ ক্ষুর আমি স্পর্শও করিনি। খুনীর হাতের ছাপ অবশ্য পেতে পারেন।'

'খুনী তো তুমি ছাড়া আর কেউ নয় মিস্টার নৃসিংহ। তুমি তো বার বার বলছ যে পুরুষোত্তমের ফ্ল্যাটে তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। ডক্টর হার্টজ্ অবশ্য এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তো বেশিক্ষণ থাকেন নি। হীরেটা নিয়েই তো তাঁর চলে যাওয়ার কথা। এ হেন অবস্থায় দোষী কে হতে পারে বলতে পার?

'না।' নরসিংহ মূর্তি জবাব দিল, 'কিন্তু আমি নির্দোষ।'

'দোষী কে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়া যায় না নৃসিংহ। আপাততঃ তোমাকে আমাদের অতিথি হতে হবে।

সুবীর বললে, 'আচ্ছা মিস্টার নরসিংহ মূর্তি, পুরুষোত্তমের আর্তনাদ তো আপনার কানেও যায় নি?'

'না।' নরসিংহমূর্তি জবাব দিলেন, 'আমি ঘুমোচ্ছিলাম।'

'কিছুই কি আপনি শুনতে পাননি?

'ঘুম ভাঙ্গতেই গোঙানির মত আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। উপরন্তু একটা অস্পষ্ট স্বর....তখন অবশ্য বিছানা ছেড়ে উঠি নি....আপনারা এসে কলিং বেল বাজালে পর বিছানা ছেড়ে উঠলাম....

'অস্পষ্ট স্বর! কিসের? কার?'

'তা ঠিক বুঝতে পারিনি। এখান থেকে কিছু দূরে ক্রোকোডাইল পার্কের কাছে, একটি 'এপ এ্যাণ্ড মানৃকি পার্ক (Ape and monkey park)' আছে, ওখান থেকে নানা রকম আওয়াজ আসে, ওটা হয়তো সেরকম কিছু।

'ডক্টর হার্ট্জ মাদ্রাজে এলে ওখানেই থাকেন। ঐ বাঁদুরে চিড়িয়াখানাটা ওঁর এক বন্ধু গ'ড়ে তুলেছেন। ওঁর নিজের পোষা একটা ওরাং-ওটাং রেখেছেন তিনি ওখানে। ডক্টর হার্ট্জ আমাদের ল্যাবোরেটারিতে এলে ওরাংওটাংও মাঝে মাঝে এসে হাজির হয় –'

'ওরাং-ওটাং চুলোয় যাক, ডক্টর হার্ট্জ্কে চাই আবার। গুরু গম্ভীর গলায় বললেন ভেঙ্কটরাজন, 'পুরুষোত্তমের সঙ্গে ওঁর কি কথাবার্তা হয়েছিল আমার জানা চাই।'

'দেখুন মিস্টার ভেঙ্কটরাজন,' সুবীর ভেঙ্কটরাজনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, 'ডক্টর হার্ট্জ একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, এ যুগের শ্রেষ্ঠ জীবন-বিজ্ঞানী বলা চলে তাঁকে, তাঁর ওপরে পুলিশি জুলুম কিন্তু আমি সইবো না...'

'জুলুম নয় ডক্টর সিন্‌হা, ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছিলাম। ম্যাটাডর ভ্যানে করে উনি একটু আগে মাদ্রাজ থেকে চ'লে গিয়েছেন বলছিলেন না, কোথায় গিয়েছেন ?'

'কন্যাকুমারী। ওখানে ওঁর ল্যাবোরেটারি। কিন্তু ওখানে গেলেও ওঁর দেখা পাবেন ব'লে মনে হয়, না গবেষণার কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন তিনি।

'দিনরাত গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকলেও হীরে কেনার সখ হয়েছিল তাঁর, বাজার দরের আড়াই গুণ দাম দিয়ে হীরে কিনেছিলেন, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের আওতায় আসে না ডক্টর সিন্‌হা।'

'অবশ্যই আসে। ডক্টর হার্ট্জ যা কিছু করেন সব বিজ্ঞানের জন্যই করেন। আমি যতদূর জানি ঐ হীরেটি তিনি তাঁর নতুন তৈরি মাইক্রোস্কোপের জন্য কিনেছেন। তাঁর কন্যাকুমারীর ল্যাবোরেটারিতে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো মাইক্রোস্কোপ গ'ড়ে তুলতে চলেছেন।'

ঠিক আছে, এই খুনের ব্যাপারে ডক্টর হার্ট্জকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার নেই। তবে তিনি আবার মাদ্রাজে এলে দয়া করে আমাকে জানাবেন ডক্টর সিন্‌হা, তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করব, অটোগ্রাফ নেব...

রক্তমাখা ক্ষুরটি ভেঙ্কটরাজন টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখেছিলেন, তার দিকে, তাকিয়ে সুবীর বললে, 'ওটা আমি একটু দেখতে চাই মিস্টার ভেঙ্কটরাজন।'

'নিশ্চয়ই'। ব'লে নিজের হাত থেকে দস্তানা খুলে সুবীরকে দিলেন ভেঙ্কটরাজন। তারপর বললেন, দস্তানাটি প'রে নিয়ে ওতে হাত দিন ডক্টর সিন্‌হা। আমার মনে হচ্ছে ওতে খুনীর আঙ্‌ুলের ছাপ আছে। আমাদের আঙ্‌ুলের ছাপ দিয়ে তাকে নষ্ট করা উচিত হ'বে না।'

'নিশ্চয়ই না।' ব'লে দস্তানাটি পরে নিল সুবীর। তারপর তুলে নিল ক্ষুরটি।

'এটা কি দাড়ি কামাবার ক্ষুর মিস্টার নরসিংহমূর্তি ? সুবীর প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। নরসিংহমূর্তি জবাব দিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ক্ষুরটাকে পরীক্ষা ক'রে সুবীর বললে, 'ডেড্ বডির মত এতেও আঙ্‌ুলের কোন ছাপ নেই মিস্টার ভেঙ্কটরাজন। আঙ্‌ুলের ছাপ না থাকলেও ধুলো আছে, রক্ত মাখা ধুলো। স্লাইডে এই ধুলোর নমুনাও তুলে নিচ্ছি।'

ভেঙ্কটরাজন টাট্টার সুরে বললেন, ধুলোর পর ধুলোর নমুনা তুলছেন তো তুলুন, আমার চোখে ধুলো দেবেন না।'

'চোখ খুলে দেব আপনাদের, অপরাধীকে ধরিয়ে দেব।

লীলাবতী বললেন, 'অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়ে এই নির্দোষ নরসিংহমূর্তিকে মুক্তি দিন।

সুবীর বললে, নরসিংহমূর্তি নির্দোষ প্রমাণ হ'লে অবশ্যই তিনি মুক্তি পাবেন।'

ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'নৃসিংহ অবতার আপাততঃ আমাদের হেফাজতে থাকবে। আমার কাছে এই হত্যাকাণ্ড অবশ্য নৃসিংহের লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ ফ্ল্যাটে আর কেউই ছিল না।'

সুবীর বললে, 'হত্যার কথাই ভাবছি আমরা, ব্যাপারটা যে আত্মহত্যাও হতে পারে তা আমাদের মনেও হচ্ছে না।,

ভেঙ্কটরাজন বললেন, এমন বীভৎস ভাবে কেউ আত্ম-হত্যা করতে পারে না।

সুবীর ক্ষুরটা টেবিলে নামিয়ে রেখে স্লাইডগুলো তার ব্যাগে পুরল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলি মিস্টার ভেঙ্কটরাজন।'

লীলাবতী বললেন, 'আপনার স্ত্রী তো আমার ফ্ল্যাটে আছেন, চলুন আমার ফ্ল্যাটে।'

লীলাবতীর ফ্ল্যাটে এসে সুবীর দেখে যে ভয়ের রেশ তখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে করবীকে। সে চোখবুজে বসে আছে লীলাবতীর বাইরের ঘরের সোফার ওপরে এবং পুরুষোত্তমের মৃতদেহটিকে স্মরণ ক'রে শিউরে উঠছে থেকে থেকে। তার কাঁধে হাত রেখে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে সুবীর বললে, 'এখনো ভয় কাটিয়ে উঠতে পার নি। একটা ডেড্ বডিকে ভয় কিসের। একটা ডেড্ বডির সঙ্গে এক টুকরো পাথরের কোন পার্থক্য নেই।'

'এ রকম বীভৎস ডেড্ বডি আমি আগে কখনো দেখিনি।' করবী ভয়ার্ত স্বরে বললে, 'সর্বদাই যেন চোখের সামনে ভাসছে, চোখ বুঁজলেও দেখতে পাচ্ছি।'

'ডেড্ বডিটা মুছে ফেল তোমার মন থেকে, এখন জীবন্ত মানুষদের দিকে মন দাও। ভেঙ্কটরাজন পুরুষোত্তমের বন্ধু নরসিংহ মূর্তিকে ধরে নিয়েগেছেন। আমাদের প্রমাণ

ডেড্ বডিটা মুছে ফেল তোমার মন থেকে...

করতে হবে যে সে নির্দোষ। ডেড বডি থেকে অনেকগুলো স্লাইড তুলে নিয়ে এসেছি। চল ল্যাবোরেটারিতে গিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করি।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন এপ্ এ্যাণ্ড মান্কি পার্ক'-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুরুজাদা কৃষ্ণ রাও। সুবীরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন 'আপনাদের কাছে এসেছি। ডক্টর হার্টজই বলেছিলেন আমাকে আপনাদের দুজনের, বিশেষ, করে মিসেস সিন্হার সঙ্গে আলাপ করতে।

সুবীর বললে, শুনছ তো করবী, মিস্টার রাও ডক্টর হার্ট্জের পরামর্শমত বিশেষ ক'রে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। ডেড্ বডির কথা ভুলে কথা বল এঁর সঙ্গে।

নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে করবী।

'বলুন মিস্টার গুরুজাদা কৃষ্ণ রাও, কি করতে পারি আমরা আপনার জন্য ?' সুবীর প্রশ্ন করে।

'আমার জন্য নয়, আমার মান্কি ও এইপ্দের জন্য আপনাদের সাহায্য চাই। কৃষ্ণ রাও জবাব দিলেন, বাঁদরদের নিয়ে সমস্যা নেই, কারণ ওরা এদেশেরই বাঁদর, এদেশের ফলমুল খেয়ে বেঁচে আছে, সমস্যা দেখা দিয়েছে বিদেশী এইপ্ মানে লেজহীন বাদরদের নিয়ে। ওরা এদেশের ফল খেলেও সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য ওদের নিজেদের দেশের বিশিষ্ট ফলমূল খাওয়ানো দরকার। যেমন ধরুন ডক্টর হার্টজের ওরাং ওটাং। ওর দেশ বোর্ণিওতে। এখানকার কলামূলো খেয়ে সে বহাল তবিয়তে থাকলেও ডক্টর হার্ট্জ্ ওকে বোর্ণিওর বেরী গাছের (berry) ফল খাওয়াতে বলেছেন। কন্যাকুমারীতে তাঁর ল্যাবোরেটারির বাগানে তিনি এই গাছ লাগিয়েছেন, তাতে ফুল ও ফল ফলছে। তিনি প্রায়ই তাঁর বাগানের ঐ গাছ থেকে ফুল ও ফল নিয়ে আসছেন তাঁর ওরাং-ওটাংটাকে খাওয়াবার জন্য।'

'তিনি কি শুধু এইজন্যেই আসেন মাদ্রাজে ? সুবীর প্রশ্ন করল।

'না, না, শুধু এইজন্যে নয়, অন্য কাজও তাঁর থাকে। এবারে কি একটা জরুরি কাজে এসেছিলেন, সেই কাজ সেরে একটু আগে তিনি কন্যাকুমারীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁর মত বৈজ্ঞানিকের কাজ বোঝা আমার কর্ম নয়, তাঁর কাজের কথা থাক, আমার কাজের কথায় ফিরে আসি। আমার কাজ আমার পোষা প্রাণিদের দেখাশোনা; খাওয়ানো। ডক্টর হার্ট্জ্ বলেছিলেন তাঁর ওরাং ওটাংয়ের জন্য আমার বাগানে বোর্ণিওর বেরী গাছ লাগাতে। তাঁর

কাছ থেকে চারা নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও তা পেরে উঠিনি এ পর্যন্ত। এবারে ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ আমাকে, বললেন যে যা আমি পারিনি, তা নাকি মিসেস সিন্‌হা পেরেছেন।

করবী বললে, হ্যাঁ, ডক্টর হার্ট্‌জ্‌-এর কাছ থেকে চারা নিয়ে অন্যান্য বিদেশী গাছের সঙ্গে বোর্ণিওর বেরীও লাগিয়েছি। রকমারি বিদেশী গাছের সঙ্গে ওটা লাগিয়েছি আমার গবেষণার জন্য।

কৃষ্ণ রাও বললেন, 'আপনার কৌশলটি আমাকে বলবেন মিসেস সিন্‌হা? আপনার পদ্ধতিতে আমিও ও গাছ আমার বাগানে লাগাবার চেষ্টা করব।

'আমার ল্যাবোরেটারিতে আসুন, আমাদের হর্টিকাল্‌চারিস্ট সব কিছু বুঝিয়ে দেবে আপনাকে।'

জানলেন মিসেস সিন্‌হা, ওরাং ওটাংটা গাছে চ'ড়ে ফল খেতে ভালবাসে বলে ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ এখানে এলেই ওকে আপনাদের বাগানে নিয়ে যান।'

'তাই নাকি! ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ যে তাঁর ওরাং ওটাংকে নিয়ে আমাদের বাগানে বেড়াতে আসতেন তা আমরা জানতাম না।'

এমন সময় ভেঙ্কটরাজন ঘরে ঢুকে লীলাবতীকে বললেন, 'বড়ই ক্লান্ত, একটু কফি পেতে পারি মিসেস রঙ্গনাথন?'

'নিশ্চয়ই। লীলাবতী, জবাব দিলেন, 'শুধু আপনি কেন; সবাই পাবেন।

বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'বুঝলেন ডক্টর সিন্‌হা, হীরেটা পুরুষোত্তমের জুয়েল কেস বা সিন্দুকে নেই, নরসিংহরাওয়ের বাড়ি সার্চ করে তাঁর কাছেও পাইনি, অতএব ধরে নিতে হয় হীরেটা ডক্টর হার্ট্‌জ নিয়ে গিয়েছেন।'

'তাতো নিয়ে যাবেনই।' সুবীর বললে 'হীরেটা তো তিনি, পুরুষোত্তমের কাছে রেখে যাবার জন্য কেনেন নি।

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, এই নৃসিংহ অবতার হীরেটাকে বেচে দেওয়ার পর আত্মসাৎ করার জন্য পুরুষোত্তমকে খুন করেছে অবশ্য এমনও হতে পারে যে নরসিংমূর্তি পুরুষোত্তমকে খুন করার পর তার কোন সাকরেদ মারফত হীরেটাকে পাচার করে দিয়েছেন।

কয়েক ঘণ্টা বাদে ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ কন্যাকুমারী পৌঁছে যাবেন। তাঁকে ফোন করে জেনে নিতে পারব হীরেটা নিয়ে তিনি সেখানে নিরাপদে পৌঁছেছেন কিনা। ততক্ষণের জন্য ধৈর্য ধরুন মিস্টার ভেঙ্কটরাজন...' [চলবে]

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

1. কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মান উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।
2. লেখা হবে স্পষ্ট হস্তাক্ষর ফুলস্কেপ কাগজের এক পিঠে। পাশে মার্জিন থাকবে।
3. লেখার মধ্যে একই বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে।
4. লেখায় ইংরেজি সংখ্যা সূচক (English numericals) ব্যবহার করতে হবে।
5. ভাষা হবে দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি।
6. তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত গ্রন্থ বা পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে হবে লেখার শেষে।
7. লেখার সঙ্গে আঁকা ছবি এবং আলোকচিত্র পাঠালে ভালো হয়। ছবি আঁকতে হবে সাদা ও কালোতে।
8. কি বিষয়ের লেখা—লেখার উপরে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
9. পাণ্ডুলিপি ফেরৎ যোগ্য নয়, এজন্য লেখা পাঠাতে হবে কপি রেখে।
10. পত্রিকার প্রয়োজনে সম্পাদক যে-কোন লেখার অংশ বিশেষ গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করে প্রকাশ করতে পারবেন (
11. লেখা ও মডেল বিষয়ে যারা লেখা ও মডেলের চিত্র পাঠাবেন তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন যে লেখায় বা মডেলে কোন অনুকরণ বা ভুল তথ্য পরিবেশন না করেন। কপিরাইট আইন প্রসঙ্গেও সম্পাদকের কোন দায়িত্ব নেই।
12. লেখকদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক (বিজ্ঞান) লেখা প্রকাশে আমরা আগ্রহী।

আমাদের পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—সম্পাদক

P হ্যাসোবিয়া

মহঃ মাসউদ আলম

"রং নাম্বার"—বলে খুব বিরক্তি ভরে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম, সাত সকালেই দিল ঘুমটা চটকে, আমি আবার নিদ্রাদেবীর বড় একনিষ্ঠ ভক্ত, কাজেই তাঁর নিরলস আরাধনায় বাধা পড়লে বিরক্ত হওয়া তো আমার পক্ষে স্বাভাবিক ; পরম স্নেহে আবার বালিশটা আঁকড়ে ধরলাম।

—"ক্রিং ক্রিং—!" ফোনটা আবার বেজে উঠল।

—"হ্যালো—!!" আমার মেজাজ সপ্তমে।

—"থ্রি-ফাইভ-টু-থ্রি, ফোর-জিরো ?"

—"ইয়াস, রজত মিটার স্পিকিং।

—"রজু মিত্তির মাতৃভাষায় কথা বল, আমি অজিতাভ"

—"ওই ! তুই !! কবে এলি ?" আমার খুশী আর ধরে না।

—"গতকাল ভোরের ফ্লাইটে, আজ সারাদিন ফ্রি আছি, চলে আয় আমার ফ্ল্যাটে।"

—"আচ্ছা—যাব," ফোন নামিয়ে রাখলাম।

অজিতাভ আমার বাল্যবন্ধু। কলেজ জীবনটাও দুজনে এক সাথেই ছিলাম। তারপর সময়ের স্রোতে আমি সরকারী অফিসার আর ও প্রফেসর। তবে এদেশে নয়—আমেরিকায়, ওখানেই ও থাকে। মার্কিন নাগরিকত্বও পেয়ে গেছে, ওর সাথে তাই দেখা হয় বহুদিনের ব্যবধানে। কিন্তু বন্ধুত্ব কাজও সবুজ।

ড্রাইভার অত সকালে আসে নি,—আমি সাধারণত ন'টার আগে বেরোই না। আজেই আজ বাহন ছাড়াই বেরোলাম, সকালের কলকাতা। জ্যাম ছিল না রাস্তায়—বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছালাম।

গেটেই ওর সাথে দেখা হয়ে গেল। এক বৃদ্ধের সাথে কথা বলছিল ও। আমাকে সহাস্য অভ্যর্থনা জানাল—'সুপ্রভাত বন্ধুবর। এত শীঘ্রই আশা করি নি। যাই হোক ভিতরে বোস। আমি এঁকে পৌঁছে দিয়েই আসছি। কিছু মনে করিস না।

"—ঠিক আছে, ঠিক আছে তুই যা।" আমি ভিতরে ঢুকতে গেলাম। কিন্তু অজিতাভর সঙ্গী বৃদ্ধটি আপত্তি করলেন—"নানা অজিত। তোমাকে আর যেতে হবে না। এই বৃদ্ধটির জন্য তোমাদের অসুবিধা ঘটানো উচিত হবে না।"

—"না, না, কি যে বলেন—অজিতাভর সাথে গলা মিলিয়ে আমি বৃদ্ধের দিকে তাকালাম।

চমকে উঠলাম। হ্যাঁ ভদ্রলোকের মুখ দেখে। এ মুখ আমার চেনা। ঐ স্বপ্নালু চোখ বাঁ ভুরুর উপরের আঁচিল। রুক্ষ চুল—ঐ মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি। তবে চুলটা তখনও এত পেকে যায়নি, গালের চামড়াগুলোও ঝুলে পড়েনি—তখন শুধু বলি রেখাগুলো স্পষ্ট হয়েছিল মাত্র,

যাই হোক নিজেকে সামলে নিলাম। ওঁর আপত্তি টিকল না। অজিতাভর সাথে উনি এগিয়ে গেলেন। আর আমি অজিতাভর বাগানে বসে স্মৃতির অ্যালবামটা হাতড়াতে লাগলাম। ঐ ধূসর পাতাগুলোর মধ্যে ঐ মুখটা খুঁজে পেলাম। তবে অন্য পটভূমিতে।

*　　　*　　　*

বছর দশেক আগে। আমি তখন কৈশোরের শেষ সীমায়। নাকের নীচের সবুজ রেখাটা ধীরে ধীরে কালো হয়ে এসেছে। আঠারো বছর বয়সের এক দুর্দান্ত কিশোর। বেড়াতে গেছিলাম মংপু—একাই। ভারি ভাল লাগত প্রকৃতিকে, একা একা পার্বত্য পথে পথে ঘুরতাম। পাহাড়ী মানুষ তখনও ছিল সরল, অতিথি বৎসল, কতরাত কাটিয়েছি ভুটিয়া বস্তীতে—পরম সমাদরে বুদ্ধের পাহাড়ী ভক্তের দল আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।

তেমনি একদিন হাঁটছিলাম পার্বত্য পথ ধরে। রাস্তাটা পাক খেতে খেতে নেমে গেছে মংপু থেকে রামবি বাজার পর্যন্ত। তখন বেলা পড়ে এসেছে। ঘনকুয়াশা চারদিক ঢেকেদিয়েছে।—বিশাল এলাকা সবুজ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে পেছে সবুজ, অরণ্যের বন্যা। গা ছমছম করা নিরবতা ভেঙে কোথাও পাহাড়ী ঝর্ণা গান ধরেছে ভৈরব কল্লোলে ; টেলিগ্রাফের খুঁটি নেমে গেছে—বহু দূরে। দিকচক্রবালে সবুজের সাথে তার মিতালী হয়েছে। ঐ টুকুই বাস্তবতার পরশ—বাকি সর্বত্রই প্রাকৃতি নিজেকে উদ্ভাসিত করেছে বিশাল রূপে। রাস্তার দুধারে বুনো বাঁশের ঝাড় পরস্পর মিতালী করছে। আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম।

হিমেল বাতাসে হেমন্তের অরণ্যের সুগন্ধ পাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। পার্বত্য অঞ্চলের এ এক

সমস্যা বিনা নিমন্ত্রনেই বৃষ্টি দেব হাজির হন। দৌড় লাগালাম। দৌড়-দৌড়-দৌড়....একটা আশ্রয়ের সন্ধানে সামনের দিকে ছুটছিলাম। সামনে কোন বাড়ি পড়লে আশ্রয় পাব।

এই এলাকার সাথে আমার পরিচয় খুব নিবিড় নয়। তাই প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে পথ হারিয়ে ফেলি। আবার পথ চলতি কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিই আমার পরের দিশা, আজ পথে লোকজন নেই। যতদূর চোখ যায় সবুজ অরণ্য। মুখে লাগছে বৃষ্টির হিমেল ঝাপটা, তবু ছুটছি—অনিশ্চিত একটা আশার পিছনে।

ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসছে। রাত্রির সাথে এই অঞ্চলের ভারি ভাব। চারটে বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যারানী বেনী বিছিয়ে দেয়। চারদিকের জমকালো আঁধারেই সেটা মালুম দিচ্ছিল। সামনের পথও অস্পষ্ট—মনের আর্শিতে একটা কালো ছায়া পড়ছিল। দূরে একটা আলো নজরে এল, কোন বস্তি শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই।

নতুন উদ্যমে ছুটতে থাকলাম। হ্যাঁ একটা বাড়িই বটে। উঠে পড়লুম বারান্দায়। ঘন আঁধারে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। সেটাও আমার মতই আশ্রয় প্রার্থী, চিৎকারের সাথে কুকুরটাকে ক্রুদ্ধ দাঁত গুলোও বেরিয়ে পড়ছিল বারে বারে। কুকুরে আমার খুব ভয়—ভাবছিলাম পালবো কিনা—এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটা গলা কুকুরটাকে ধমকে দিল।

আমি আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠলাম—না কুকুরটাকে চুপ করতে দেখে নয়—ঐ গলাটার মালিকের ভাষা শুনে, সেটি ছিল পরিষ্কার বাংলা ভাষা, কাজেই একটু ইতস্ততঃ করেই ভেজানো দরজাটা ঠেললাম। ভিতরে এক ভদ্রলোক টেবিলে ঝুঁকে মগ্ন হয়ে কিছু লিখছেন। আমার উপস্থিতি অনুভব করলেন না। এমন সময় কুকুরটা আবার বিশ্রি ভাবে ডেকে উঠল। ভদ্রোলোক মুখ তুলে তাকালেন।

বাইরে তখনও অবিরাম ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। বাড়ির কাঠের ছাদে টুপ টাপ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। চারিদিকে গাঢ় আঁধার পরিবেশটাকে আরো ভারী করে তুলেছিল। ঘরের ভিতরের নিস্তব্ধতায় একটা শব্দই প্রবল আক্রোশে এখানে পাক খাচ্ছিল। সেটা হল নিস্তব্ধতার নৈশাব্দিক শব্দ।

ভদ্রলোকের মুখটা সাধারণের মতই। বাঁ ভুরুর উপর একটা আঁচিল। অদ্ভুত ওঁর চোখ দুটো, স্বপ্নালু গভীর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি বাঙালী?"

—"হ্যাঁ।"

—"আমিও বাঙালী—বিপন্ন। বাইরে প্রবল দুর্যোগ আপনার ঘরে রাতটুকু কাটাতে পারি?"

উনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন, মাথা পেতে সম্মতি দিয়ে ভিতরের বিছানার দিকে ইশারা করলেন।

আমি ঘরে ঢুকে খাটে বসলাম। উনি আর কোন কথাই বললেন না। জানলেন না পরিচয়। আবার লেখায় মন দিলেন। আমি দেখতে লাগলাম ঘরটা। একটা খাট আর একটা চেয়ার টেবিল—এই আসবাব, আর আছে অগুন্তি বই, কৌতুহল হলো ওঁর সম্পর্কে। কিন্তু উনি কথা বলতে চাইছেন না তা বুঝলাম, মনে মনে ওঁর সম্পর্কে ধারণা করতে চাইলাম।

তারপর আমার ক্লান্ত শরীরটা কখন ঘুমে ঢলে পড়েছিল মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম আকাশের কান্না থেমে গেছে। কাঁচের সার্শি দিয়ে সোনালী রোদ বিছানায় পড়েছে। তবে বাতাসের ফোঁপানি থামে নি। বিছানায় উঠে বসলাম। আমি অনুভব করলাম আমার ক্ষিধে পাচ্ছে, কিন্তু তার চেয়ে প্রবল হয়েউঠেছে আমার কৌতুহল। কে উনি? দূরে মাতাল ঝর্ণা গতরাত্রির মত গর্জাচ্ছে। আর দেখলাম ঐ ভদ্রলোক তাঁর টেবিলে বসে লিখে যাচ্ছেন, উনি কি সারারাত জেগে ছিলেন না এখনই উঠলেন?

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ওঁর টেবিলের কাছে। উনি লিখতে লিখতেই বললেন—"ঘুম কেমন হল?"

—"খুব ভাল। আপনি কাল আমাকে আশ্রয়..."

আমার কথা শেষ হল না। উনি বললেন—"বিপন্ন একজনকে আশ্রয় দেওয়া মানুষের কর্তব্য। কিন্তু সে যাই হোক তুমি এই এলাকার মানুষ নও—বাড়ি ফিরতে পারবে তো?"

—"পারব, এভাবে আমি বহুবার হারিয়েও ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। গত রাত্রে আসলে বৃষ্টিটা নেমেই সব গণ্ডগোল করে দিল।"

—"আচ্ছা তাহলে তুমি যেতে পার।" যাওয়ার তাড়া আমার কিছু কম ছিল না। পেটে তখন খাদ্য-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল আমার কুতূহল, বললাম—"আমি ফিরে যাচ্ছি কিন্তু আপনার পরিচয় কি জানতে পারি?

—"পরিচয় বলতে যদি নাম ধাম জানতে চাও তবে তা অযৌক্তিক হবে, তবে আমার সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মিটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু দুটো শর্ত আছে; এক, তা যেন গোপন থাকে এবং দুই পরে কখনও আমাকে বিরক্ত করা চলবে না।"

—"আমি রাজি।"

—"তবে শোন—" উনি বলতে লাগলেন, আমি একজন সৈনিক। মানুষের সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করি।"

"—সমস্যা?"

—"হ্যাঁ সমস্যা, বর্তমানে তিনটি সমস্যা মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনছে। এদের আদ্যক্ষর P এগুলি হল Poverty, Population এবং Pollution. আমি লড়ছিলাম Pollution এর বিরুদ্ধে। মানুষের পরিবেশ তথা সমগ্র জীবজগতের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। এর একটা কারণ জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ। এই কীট নাশক প্রাথমিক ভাবে কিছু কাজ করলেও প্রধানতঃ পরিবেশে দূষিত পদার্থ রূপেই জমা হয়, এছাড়া কারখানা বা জাহাজের ছাড়া গাদে জল দূষিত হয়। জলজ প্রাণীরা বিপন্ন হয়ে ওঠে। U. N. O 1972-এ স্টকওহমে একটা সভা ডাকে, সেখানে আমি ছিলাম।

ঐ সভাতেই আমার সাথে "ব্যাকটেরিওলজি ও ভাইরোলজির" বিজ্ঞানী হ্যান্স স্মিথের সাথে পরিচয় হয়। আমি "মলিকুলার বায়োলজির" গবেষক হলেও 'ভাইরোলজি' সম্পর্কে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল, তাই হ্যান্সের সাথে আমার বন্ধুত্ব হতে দেরী হল না, আমরা ঠিক করলাম Pollution রুখতে 'Biological control' চালু করতে হবে। আমরা ঠিক করলাম বিভিন্ন জীবের মধ্যে সংকরায়ন ঘটিয়ে একটি নতুন প্রজাতি আমরা গড়ে তুলব যারা কীটের লার্ভা বা সাগরের গাদ খেয়ে বা অন্য উপায়ে ধ্বংস করে দেবে অথচ জীবজগতের কোন ক্ষতি করবে না।

প্রথমে শুরু হল ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সংকরায়ন। উত্তর আমেরিকার হান্সের বাড়িতে শুরু হল গবেষণা। কিন্তু সংকরায়নের সফলতা তখনই আমরা পাইনি, কিন্তু একটা বিশাল সর্বনাশের সম্মুখীন হলাম। আমরা একটা বিশেষ ধরনের "স্ট্যাফাইলো কক্কাই জাতীয় ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করলাম যারা কোন উপকার তো করেই নি বরং মানব দেহে রক্ত দূষণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমি হান্সকে প্রস্তাব দিলাম গবেষণা বন্ধ করার।

কিন্তু হ্যান্স আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করল। ফলতঃ ঐ স্ট্যাফাইলো কক্কাই থেকে জন্ম নিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়া। আমরা তার নাম দিলাম "হ্যান্সবিয়া"। তবে ভরসা এই সেটি তখনও টেস্টটিউবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল। আমি দেখলাম এটি সক্রিয় হলে অতি দ্রুত বংশ বিস্তার করবে। এদের জীবদেহে ঢোকার অসাধারণ ক্ষমতা থাকবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের যাবতীয় লৌহ ঘটিত পদার্থকে নষ্ট করবে। রক্তকে বিষাক্ত করার ক্ষমতা এদের থাকবে। আমার আন্তরিক অনুরোধেও হ্যান্স ওটিকে ধ্বংস করার পদ্ধতি আবিষ্কারে রাজি হলো না, বরং ওকে সক্রিয় করতে চাইলো।

আমি বুঝতে পারলাম না কেন হঠাৎ ও এই ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠল। আমি ওকে ত্যাগ করে দুই মাস আগে এই নির্জনে এসেছি। সঙ্গে হ্যান্সোবিয়ার যাবতীয় তথ্য। এখন আমি প্রাণ পনে চেষ্টা করছি 'হান্সোবিয়াকে ধ্বংসের পদ্ধতি আবিষ্কার করতে। যদি না পারি তবে সারা বিশ্বে জানিয়ে দেব হ্যান্সেবিয়ার ইতিহাস, আর সফল হলে গোপনে একদিন ওকে ধ্বংস করে দেব। ওটি সৃষ্টির সকল তথ্য আমার কাছে; কাজেই আমি ছাড়া আর কেউই 'হ্যান্সো-বিয়া' সৃষ্টি করতে পারবে না। হ্যান্সও নয়।'

—'কিরে তুই এখনো বাইরে বসে?" অজিতাভর গলা শুনে চমক ভাঙল। বললাম এই একটু বসে ছিলাম। চল ওপরে চল।"

অজিতাভকে জিজ্ঞেস করলাম—"ঐ বৃদ্ধ কে রে?"

উনি একজন মহাজ্ঞানী। আজ দশ বছর শিকাগোয় একটা গবেষণা সংস্থার প্রধান হয়ে আছেন। আমার সাথে এক বছর আগে আলাপ হয়। এখন দেশে এসেছেন, আগামীকাল দিল্লীতে 'মলিকুলার বায়োলজির' একটা confarance-এ যোগ দিতে।"

—"ওহ।" মনে মনে ভাবলাম অজিতাভকে বলব ঘটনাটা?—থাক কি হবে বলে? 'হান্সোবিয়া' নিশ্চয়ই আর নেই, নয়ত এতদিনে বিশ্ব ওর কথা জানত।

স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, দশম শ্রেণী, ক-বিভাগ।

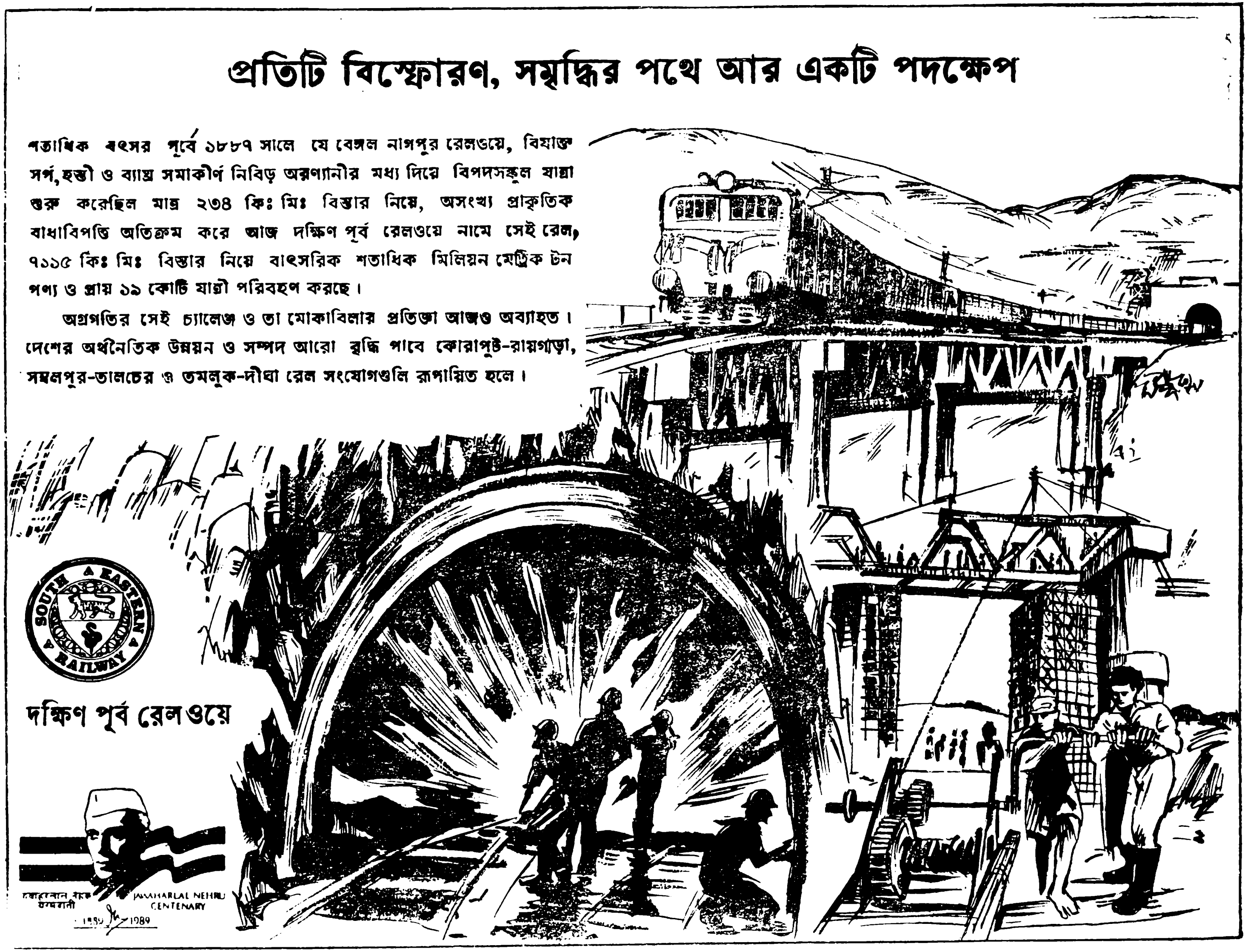
প্রতিটি বিস্ফোরণ, সমৃদ্ধির পথে আর একটি পদক্ষেপ
শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৮৭ সালে যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, বিষাক্ত সর্প, হস্তী ও ব্যাঘ্র সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে বিপদসঙ্কুল যাত্রা শুরু করেছিল মাত্র ২৩৪ কিঃ মিঃ বিস্তার নিয়ে, অসংখ্য প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আজ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নামে সেই রেল, ৭১১৫ কিঃ মিঃ বিস্তার নিয়ে বাৎসরিক শতাধিক মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য ও প্রায় ১৯ কোটি যাত্রী পরিবহণ করছে।
অগ্রগতির সেই চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলার প্রতিজ্ঞা আজও অব্যাহত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাবে কোরাপুট-রায়গাড়া, সম্বলপুর-তালচের ও তমলুক-দীঘা রেল সংযোগগুলি রূপায়িত হলে।
SOUTH EASTERN RAILWAY
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

জাতির সেবায় দক্ষিণ-পূর্ব রেল

নিখিলেশ মিত্র

[জেনারেল ম্যানেজার দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে]

রেল পরিবহণ কাঁচামাল সরবরাহকৃত স্থান থেকে শিল্প-কেন্দ্রে কাঁচামালের সরবরাহ এবং সেখান থেকে বাণিজ্য কেন্দ্রে তৈরী মাল চালানোর ভৌগোলিক দুরত্ব ক্রমাগত হ্রাস করে সারা বিশ্বে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতে পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে আমাদের দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাকারী ও ভারতের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দূরদৃষ্টিই ছিল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কৃতিত্বের মূলে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুক্তিদান ও তার রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতীয় রেলের দ্রুত অগ্রগতির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়।

নিখিলেশ মিত্র

অগ্রগতি ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ

ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে দক্ষিণ পূর্ব রেল উপযোগী মালপত্র সরবরাহ করে। দুর্গাপুর ব্যতীত, অন্যান্য ইস্পাত কেন্দ্রগুলি এই রেলের আওতাভুক্ত। আকরিক লৌহ সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্গাপুরও সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ পূর্ব রেলের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া আরো একটি প্রকান্ড ইস্পাত কেন্দ্র বিশাখাপত্তনমে নির্মিত হচ্ছে। সমগ্র ভারতীয় ভারতীয় রেলের 62,000 কি.মি. প্রসারিত রেলপথের মধ্যে মাত্র 7,115 কিমি. বিস্তার নিয়েও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সারা দেশে রেলপরিবাহিত পণ্যের এক তৃতীয়াংশ পরিবহণ করছে। এ জন্য অতি সঙ্গত কারণেই দক্ষিণ পূর্ব রেলকে ভারতীয় রেলের 'ব্লু চীপ' বা মধ্যমণি বলে অভিহিত করা হয়।

যাত্রী পরিবহণ ও গুডস্ টার্মিনাল ঃ

যাত্রী সাধারণকে আরো বেশী সুযোগ সুবিধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ও হাওড়া স্টেশনের উপর থেকে যাত্রীভিড় হ্রাস করার জন্য শালিমারে একটি আধুনিক যাত্রী টার্মিনাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এটির নির্মাণকাজে হুগলী নদীর উপর নির্মিয়মাণ দ্বিতীয় সেতুর নির্মাণের সঙ্গে শেষ হবে।

নতুন প্রকল্প ঃ

73 কোটি টাকা ব্যয়ে 87·5 কি.মি. দীর্ঘ তমলুম-দীঘা রেল লাইনের নির্মাণ কার্যও চলছে। এটির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হলে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী কৃষিপ্রধান এলাকাগুলির বিকাশ ও পর্যটনের উন্নতি সাধিত হবে।

রেল ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা ঃ

কলকাতা থেকে বোম্বাই ও মাদ্রাজগামী সমস্ত ট্রেনের আসন সংরক্ষণের কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। এই সমস্ত কম্পিউটারাইজড আসন সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলি হল ওল্ড কয়লাঘাট স্ট্রীট, নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং, ফেয়ারলী প্লেস, রবীন্দ্র সদন, হাওড়া, শিয়ালদহ ও দমদম।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ

ট্রেনের বিভিন্ন রক্ষক দলের সঙ্গে গ্রাউণ্ড স্টেসনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যও চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের অধিকতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে জি. আর. পি. রক্ষক দলের হাতে ওয়াকি-টকি সেট দেওয়া হয়েছে।

কর্মীকল্যাণমূলক কার্যপ্রণালী ঃ

রেলকর্মীদের চিকিৎসার জন্য 11টি হাসপাতাল, 2টি পলিক্লিনিক ও 82টি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র আছে।

ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ / মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় স্বাক্ষরতা কার্যক্রম রূপায়িত করতে এই রেলে 58টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ও রেলের বিভিন্ন বিভাগে শীঘ্রই আরও 12টি কেন্দ্র খোলা হবে।

যে সমস্ত কর্মী এক মাসের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবেন, তাঁদের অবসরকালীন যাবতীয় অর্থ পরবর্তী মাসের প্রথম কর্ম দিবসে নিয়মিতভাবে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পেনসন সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ সমাধান করতে ও পেনসন প্রাপকদের সন্তোষ সাধনের জন্য সদর দপ্তর ও রেলের বিভাগীয় অফিসগুলিতে 'পেনসন আদালত বসানো হয়েছে।

আসল কিম্বা নকল

সুনীত রায়

পাড়ার মোড়ে লাহিড়ী বাবুর সোনার দোকানের সামনে খুব ভীড়। খুব জোর কথা কাটাকাটিও যে চলছে তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ভীড় করে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের জিগ্যেস করলাম, কি হয়েছে কি? এত গণ্ডগোল কিসের জন্যে। সবাই বলল, গণ্ডগোলটা ঠিক কি নিয়ে তা বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে পাথর কেনা-বেচা নিয়ে কিছু একটা হবে। ভীড় ঠেলে দোকানের ভেতর ঢুকে দেখি, আমাদের পাড়ার কানাইবাবুর সঙ্গে লাহিড়ীমশাইয়ের জোর কথা কাটাকাটি চলছে। কাউকে কিছু প্রশ্ন না করে আলোচনা থেকে যেটা বুঝলাম, সেটা হল কানাইবাবুর জ্যোতিষী শনিগ্রহ শান্তির জন্যে একটা নীলা পরতে বলেছিলেন। কানাইবাবু বিশ্বাস করে এই লাহিড়ীমশাইয়ের দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে একটা নীলা কিনে নিয়ে যান। কিন্তু, সে নীলা দেখে জ্যোতিষী বলেছেন—ওটা আসল নীলা নয়। সম্পূর্ণ নকল। এই পাথরে কোনো কাজই হবে না। কানাইবাবু সে কথা শুনে পাথরটাকে নিয়ে সোজা লাহিড়ীমশাইয়ের দোকানে এসে হাজির, এসেই লাহিড়ীমশাইকে নকল পাথর বিক্রী করার জন্যে ঠগ, জোচ্চোর বলে খুব গালিগালাজ করেন। তারপর পাথরটাকে দিয়ে দাম ফেরৎ চান। লাহিড়ীমশাইও উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, আপনার জ্যোতিষী একজন জোচ্চোর। আসল পাথরকে নকল বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, কানাইবাবু যাতে সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই পাথর কেনে। জ্যোতিষীকে অপমান করায় আবার কানাইবাবু খুব রেগে যান। শেষ অব্দি কি হয়েছিল জানি না। আর নীলা পাথর সত্যিই শনি গ্রহকে শান্ত করে কিনা আমার জানা নেই, তবে এই ধরনের ঝগড়া প্রায়ই সর্বত্র হয়। কারণ আমরা সাধারণ মানুষেরা জানি না কোনটা আসল পাথর আর কোনটা নকল পাথর। তার ফলে সবসময়েই জ্যোতিষী কিম্বা পাথর ব্যবসায়ীদের কথার ওপর বিশ্বাস করতে হয়। আজকালকার আসল আয় নকল পাথরের মধ্যে চারিত্রিক গুণগত বৈশিষ্ট্য এতই একধরনের যে খুব সহজে দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার। তবুও প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরী একটা জিনিস আর কৃত্রিম উপায়ে তৈরী একটা জিনিসের সামান্য কিছু তফাৎ থাকবে। আর তারই ওপর নির্ভর করে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি কোনটা আসল আর কোনটা নকল।

পাথরের মধ্যে কি কি জিনিস দেখলে বুঝতে পারব সেটা নকল পাথর এবং তা জানার আগে জানতে হবে কিভাবে এই নকল পাথর তৈরি করা হয়। 1837 সালে বিজ্ঞানী গডিন প্রথম কৃত্রিম চুনী গবেষণাগারে তৈরী করেছিলেন। ফটকিরির সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়াম মিশিয়ে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করে এই ছোট্ট চুনীটি তৈরী করা হয়েছিল। চুণীর আসল রঙটা আনার জন্যে ক্রোমিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল। 1847 সালে বোরিক অ্যাসিডে আলুমিনা গরম করে তৈরী হয় সাদা নীলা। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ধরণের মণিরত্ন গবেষণাগারে তৈরি হচ্ছিল। অবশেষে 1902 সালে বিজ্ঞানী ভারনুয়েল প্যারিস শহরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম চুনী তৈরি করা শুরু করেন। তারপর অবশ্য ঐ একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রঙের চুনী, নীলা, পোখরাজ তৈরি করা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে, কি যন্ত্রে আর কি উপায়ে এই মনিরত্ন তৈরি করা হয় তা একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বিজ্ঞানী ভারনুয়েল যে পদ্ধতিতে সাদা নীলা তৈরি করেছিলেন সেটাই উদাহরণস্বরূপ আলোচনা করা যাক।

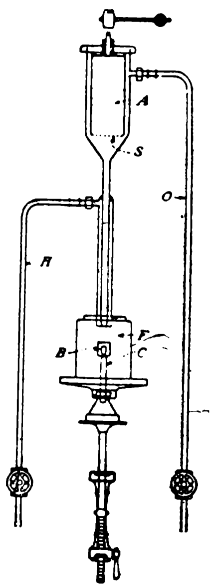

কিশুদ্ধ আর মিহিভাবে গুঁড়া করা অ্যালুমিনার টুকরো পাত্র A'র মধ্যে রাখা হয়। A'র তলায় লাগানো আছে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনি S। পাত্র A'র মাথায় লাগানো আছে একটা হাতুড়ী। হাতুড়ী দিয়ে পাত্রটি আঘাত করলে অ্যালুমিনায় পাউডার ছাঁকনীর মধ্যেদিয়ে নিচে পড়বে। নিচে যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখানে রয়েছে আগুন। এই আগুন। তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের যৌথ মিলনের ফলে। H পাইপ দিয়ে হাইড্রোজেন আর O পাইপ দিয়ে অক্সিজেন এসে মিশছে F-এর মধ্যে। এই অ্যালুমিনা প্রচণ্ড তাপে গলে গিয়ে চীনামাটির পাত্রে জমা হয়। চীনামাটির পাত্রটি স্ট্যাণ্ড

C-এর ওপর লাগানো আছে। এবার পাত্রটির ওপর গলিত অ্যালুমিনা আস্তে আস্তে একটা মটর দানার মত চেহারারর আকার নেয়। এটিকে বলা হয় বাউল বা ব্রাইন। খুব আস্তে আস্তে এই বাউলটি আকারে বড় হতে থাকে চেহারায় উপর দিকটা হয় চওড়া আর নিচের দিকটা সরু আকৃতির হয়। কখনও এই বাউলটি ঘুরতেও থাকে। যখন মনোমত আকৃতিতে এসে দাঁড়ায় তখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওরা হয়। তারপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা হয়। একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে চিমটের সাহায্যে বাউলটিকে বের করে এনে খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়। তখন বাউলটির ওজন দিয়ে দাঁড়ায় ৭৫০ ক্যারাটের মত। এভাবেই তৈরি হয় স্বচ্ছ আর রঙবিহীন সাদানীলা। এখন অ্যালুমিনা পাউডারের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় ক্রোমিয়াম অক্সাইড মেশালে কৃত্রিম লাল চুনী বিভিন্ন শেডে পাওয়া যায়। এখন ক্রোমিয়াম অক্সাইডের বদলে যদি ভ্যানাডিয়াম আর কোবাল্ট অক্সাইড মেশানো হয় তাহলে এর রঙ হয়ে যায় গায় সবুজ। তখন একে সবুজ নীলা বলা যায়।

কৃত্রিম পাথরের অজস্র সরু সরু সমান্তরাল লাইন দেখা যায় যা আসলে পাথরে থাকে না। এই সমান্তরাল লাইন তৈরি হওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে। কৃত্রিম উপায়ে বাউলটি যখন তৈরি হয় তখন এক একটা পাতলা পর্দার মত আস্তরণ পড়তে পড়তে বাউলটি আকারে বড় হয়। এই দুটি পাতলা পর্দা যেখানে মেশে সেখানেই তৈরি হয় সুরু লাইন। তাপ মাত্রার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলেও এই দাগ এসে যায়। এছাড়া পাথরটিকে রঙ করার জন্যে যে পিগমেন্ট ব্যবহার করা হর তারও অসম উপস্থিতির ফলে এই ধরনের দাগ দেখা যায়। আসল পাথরের মধ্যে এই দাগগুলি সমান্তরাল থাকে না এগুলি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত; ষড়ভুজ কিম্বা অষ্টভুজাকৃতিতে দেখা যায়। আসল পাথরের মধ্যে কখনও কখনও একই চেহারা যমজ আকৃতিতে দেখা যায় যা কৃত্রিম পাথরে দেখা যায় না।

কাঁচের কারুকার্য করা পেপারওয়েটের মধ্যে জল জমা জমা কিছু অংশ দেখা যায়। এই ধরণের জলবিন্দুকে বলা হয় "গ্যাস বাবল"। জলবিন্দু ছাড়াও কোনো কোনো অংশে জমাট মেঘের মতো দেখা যায়; এসবই ফার্ণেসের মধ্যে তাপমাত্রার সমতা না থাকার জনে তৈরি হয়। এই জলবিন্দু কিম্বা জমাট মেঘের মত এক জায়গায় জমে থাকা রঙ কোনো মনিরত্নের মধ্যে দেখা গেলে অতি সহজেই বুঝে নিতে হতে যে এটি আসল পাথর নয়।

কৃত্রিম পাথরের মধ্যে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মাঝে মাঝে কিছু ফাটলের চিহ্ন আর পাথরের ঠিক মধ্যি খানে রঙের আধিক্য যত বেশী, পাশের দিকে ততটা হাল্কা হয়ে গেছে। সাধারণত কৃত্রিম পাথর উচ্চ তাপমাত্রায় তৈরি করে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়। তার ফলে বাউলের মধ্যে যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় তাতেই ফাটলের উৎপত্তি। কৃত্রিম পাথরের কেলাস তৈরি হয় লম্বালম্বি ভাবে। তার ফলে প্রধান অক্ষটিও লম্বালম্বিভাবে তৈরি হয়। সেজন্যে পাথরটি কাটার সময়ে অন্য বরাবর কাটলে দেখা যায় এক দিকে বেশি রঙ অপরদিকে হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু আসল পাথরের কেলাস প্রাকৃতিক উপায়ে সমান ভাবেই তৈরি হয়। তাই রঙের সমতাও সর্বদিকে সমান ভাবে স্থান পরিবর্তন করে।

কৃত্রিম পান্না অবশ্য চুনী, নীলা যেভাবে তৈরি হয় সেভাবে হয় না। কৃত্রিম আর আসল পান্নার গুণগত বৈশিষ্ট্য সবই একধরণের। শুধুমাত্র কৃত্রিম পান্নার মধ্যে ফাটল আর গোলোকের মতো ঝাঁটার কাটির গুচ্ছ দেখা যায় যা প্রাকৃতিক পান্নার মধ্যে দেখা যায় না। এছাড়া আসল আর নকল পান্না অতি বেগুনী রশ্মির তলায় রাখলে দেখা যায় নকল পান্না থেকে বেরিয়ে আসছে গাঢ় লাল রঙ আর আসল পান্না একদম নিষ্প্রভ।

আসল আর নকল মণিরত্নের মধ্যে আর ও সেসব পার্থক্য আছে তা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। খালি চোখে যতটা বোঝা যায় ততটুকু বুঝতে পারলেও অনেক সুবিধা। কারণ একদম অন্ধের মত কোনো মনিরত্ন কিনে ঠকতে হবে না। তাছাড়া যে পাথর বিক্রী করছে, তাকে যদি গম্ভীরভাবে বলা যায়, এই পাথরের মধ্যে জলবিন্দু রয়েছে কেন? মনে হচ্ছে ফাটল আছে? রঙের গাঢ়তা মধ্যের দিকে এতটা হাওয়া তো উচিত নয়। কি মশাই, নকল পাথরের ব্যাবসা করে আসল পাথরের পয়সা নেবার ইচ্ছে না' কি? যদি পাথরটি সত্যিই নকল হয় তখনই সে বুঝতে পারবে যাকে এই পাথরটি বিক্রী করছি, সে একদম কিছু বোঝে না তা নয়। সুতরাং এর সঙ্গে চালাকি না করে আসল পাথর নিয়ে কারবার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এ-৩১, মনিনগর সোসাইটি, বরোদা-৩৯০০১, গুজরাট

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

বরুণ মণ্ডল

ব্যাঙ কি জল খায় ?

ব্যাঙ জলে থাকে, কিন্তু ব্যাঙ কি জল খায় ? খেলেও সেটা কিভাবে খায় ? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিনের একদল গবেষক একটি পরীক্ষা করেন। কয়েকটি ব্যাঙকে কিছু দিন শুকনো জায়গায় রেখে দেন। তারপর তাদের শরীরে জলের অভাব ঘটলে ব্যাঙগুলোকে রঙীন জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাঙের পেটে এই রঙীন জলের সন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, তার শরীরে বেশির ভাগ জল প্রবেশ করেছে চামড়ার ছিদ্র দিয়ে। মুখ দিয়ে শতকরা দু'ভাগেরও কম জল প্রবেশ করেছে। তাছাড়া মুখ দিয়ে যেটুকু জল গেছে, তা শরীরে জলের অভাবের জন্য নয়। অর্থাৎ যে-অর্থে আমাদের জল তেষ্টা পায়, ব্যাঙের সে-রকম জল তেষ্টা পায় না। শরীরে জলের অভাব ঘটলে ব্যাঙ জল খোঁজে এবং জল পেলে তাতে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকে।

ব্যাকটেরিয়াও চিন্তা করতে পারে

ব্যাকটেরিয়া জীবজগতের ক্ষুদ্রতম ও সরলতম জীব। যদিও জীবটি মস্তিষ্কহীন, মগজহীন একটি আদি কোষ ও একটি মাত্র ডি,এন,এ,সর্বস্ব, তবু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের মত জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈবিক চিন্তাধারাগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। 140 কোটি নিউরণের সাহায্যে মানুষ যা ভাবতে পারে, কোন নিউরণ না থাকা সত্ত্বেও ব্যাকটেরিয়ার পক্ষে তার অধিকাংশই ভাবা সম্ভব। বিজ্ঞানী উইলহেলম ফেফার মনে করেন, প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করার ক্ষমতা ব্যাকটেরিয়ার আছে। আর এই সিদ্ধান্তটা সে চিন্তা করার পরেই নেয়। বিজ্ঞানী জুলিয়াস এলডার লক্ষ্য করেছেন ব্যাকটেরিয়া স্নায়বিক উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে এবং উত্তেজনার সামান্য পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দিতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ণবিদ ডানিয়েল কোশল্যাণ্ড উত্তেজনায় সাড়া দেবার জন্য ব্যাকটেরিয়ার যে বিশেষ ধরণের প্রোটিন আছে, তার অণুগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার চোখ ও কান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

গঙ্গা ফড়িঙের দক্ষতা

আমাদের খুব পরিচিত একটি পতঙ্গ হল গঙ্গা ফড়িং। এরা এক জায়গায় স্থির থেকে উড়তে পারে হেলিকপ্টারের মত, পিছনের দিকে বা পাশের দিকে ইচ্ছে মত উড়তে পারে, আবার হঠাৎ খুব দ্রুত বেগে সামনের দিকেও উড়ে যেতে পারে। গঙ্গা ফড়িঙের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের উড্ডয়ণ যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছেন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়াররা। কলরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে গঙ্গা ফড়িং পাখা সঞ্চালনের সময় ইচ্ছে মত পাখাগুলোর আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। আর সেজন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণির সৃষ্টি হয় তাতেই গঙ্গা ফড়িঙের ওড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে গঙ্গা ফড়িঙের ভেসে থাকার ক্ষমতা সব থেকে দক্ষ আকাশ যানের চেয়েও তিনগুণ বেশি।

জোনাকি থেকে সাবধান

রাতের অন্ধকারে জোনাকি নিজস্ব আলো জ্বালিয়ে সকলকে জানিয়ে দেয় নিজের উপস্থিতি। তবুও যে সব প্রাণী—পাখি, টিকটিকি ইত্যাদি, পোকা ধরে খায়, তারা জোনাকি খায় না। বিষয়টি বিজ্ঞানীদের ভাবাল। নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক দেখলেন জোনাকির শরীরে এক বিষাক্ত রাসায়ণিক দ্রব্যের উপস্থিতির জন্য পাখি বা টিকটিকি জোনাকি খায় না। এই বিষাক্ত রাসায়ণিক দ্রব্য খেলে তাদের দেহে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বিবর্তন ক্রিয়ার ফলে পোকাভুক প্রাণীরা জেনে গেছে রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে উড়ে বেড়ানো এই সব পোকা খেতে নেই—খেলে মৃত্যু হতে পারে।

গাড়ির চাকায় কাঠের গুঁড়ো

কেনিয়ার গ্রামগুলোতে পরিবহনের কাজে গরু আর গাধার গাড়ি বেশি ব্যবহার করা হয়। গাড়ির চাকার ব্যবহার করা হয় ধাতুর বলয় লাগানো কাঠের চাকা অথবা রাবারের টায়ার। রাবারের টায়ারই বেশি ব্যবহার হয়। কিন্তু রাবারের টায়ার একটু পুরনো হলেই ফুটো হয়ে যায়। ফুটো টায়ার সারানো ব্যয়বহুল। এই সমস্যার সমাধান করেছেন কেনিয়ার ক্ষুদ্র খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচীর বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা দেখেছেন, বায়ুর পরিবর্তে টায়ারে কাঠের গুঁড়ো ভরলে টায়ারের কার্যকারিতা প্রায় একই থাকে, কিন্তু ফুটো হলে টায়ার চুপসে যায় না। কাঠের গুঁড়ো ভর্তি টায়ার লাগানো গাড়ি 500 কিলোগ্রাম ওজন নিতে পারবে এবং ঘণ্টায় 15 কিলোমিটার বেগে চলতে পারবে।

৭৩, শ্রীধর রায় রোড, কলিকাতা—৩৯।

মার্ক টোয়েনের 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট' অবলম্বনে

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
ছবি- গৌতম কর্মকার

বেরিয়ে আয়-যদি ক্ষমতা থাকে। লুকিয়ে পড়েছিস কেন? এতো ভয়?
ফিরে যাও বন্ধুগন, এখনো সময় আছে। আর এগিয়ে এসো না।
সামনের ঐ বেড়া স্পর্শ করলেই মৃত্যু।
আমরা তোর যাদুর ভয় করি না কাপুরুষ। বেরিয়ে আয়, লড়াই কর!
জ-জ-জ---
তারের উপর পা ঠেকতেই সব শেষ!
আঁআঁআঁ আঁ আঁ---
আহ- কী ভয়ঙ্কর!
রাজসৈন্যদের পাশাপাশি এবার ছুটে এলো বিশপের দল...
থেমো না, এগিয়ে যাও সৈন্যগণ! যাদুর ভয় কোর না। মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে মার্লিন এখনি জীবিত করে দেবেন সকলকে। এ যাদুর ঘোর। এগিয়ে চলো বীরগণ—স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের সহায়।

আবার সেই মুহূর্তের যাদু -- নিষ্প্রাণ হয়ে গেল পঁচিশ হাজার মানুষ --
পালাও -- পালাও সব -- আর এক মুহূর্তও এখানে নয় !
সর্বেসর্বার লেখা এখানেই শেষ, পরের হস্তাক্ষর ক্লারেন্সের --
সবগুলো তার নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে স্যার সর্বেসর্বা তারপর এগিয়ে গেলেন পর্যবেক্ষণে --
কোনও নিষেধ শুনলেন না ।
ক্লারেন্স -- শিগগির এসো ! একজন মনে হচ্ছে জীবিত -- স্যার মেলিয়াগ্রান্স --
ওঁকে বাঁচাতে হবে ।
আমারই দিকে পিছন ফিরলেন সর্বেসর্বা । হঠাৎ --
এই নে, তোর পুরস্কার !
পিছন থেকে আঘাত হানলেন অবিবেচক মেলিয়াগ্রান্স --
-- আহহ -- ক্লারেন্স !
আত্মবিশ্বাসী সর্বেসর্বা কোনও বর্ম বুকে রাখেননি --
স্যার -- স্যা -- র ! আপনি ভালো আছেন তো ?
না ক্লারেন্স, ছোরা আমার পিঠে বিঁধেছে !
চিন্তা করবেন না স্যার, আঘাত সামান্য । আমি ডাক্তার ডেকে আনছি ।
45

আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন স্যার সর্বেসর্বা। আমি ডাক্তারের খোঁজে ছুটে গেলাম। এদিকে মহাকুচক্রী মার্লিন···
খি খি খি·· মার্লিন যাদু জানে না ?
এখন তেরো শ' বছর তুমি ঘুমিয়ে থাকো বাছা·· তেরো শ' বছর·· খি খি খি··· মার্লিনের যাদু !
আরে, শয়তান মার্লিনটা এখন কী করছে এখানে?
এক গুলীতে আমি শেষ করে দিলাম মার্লিনের খেলা··তার বীভৎস হাসি···
গুড়ুম
···আঁআঁআঁ
তারপর একদিন গেল, দু'দিন গেল·· দিনের পর দিন গেল, সর্বেসর্বার ঘুম কিন্তু আর ভাঙলো না। আমি এবার বোতাম টিপে তাঁর সব কটি সৃষ্টি একে একে ধ্বংস করে দিলাম। এই ছিল তাঁর নির্দেশ।
কী আশ্চর্য ঘটনা! যুগের ভিতর যুগ। কোন সন্দেহ নেই যে আগন্তুক এটি দিয়েছেন তিনিই স্যার সর্বেসর্বা।
ছুটে গেলাম তাঁর কক্ষে, কিন্তু···
দেহ নিষ্প্রাণ। কী মধুর প্রশান্তি!
তেরো শ' বছরের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে এবার সত্যি-সত্যিই উনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।
ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন ! আপনার আত্মা অমর হোক!

পাখিদের জন্য

আইজাক এ্যাসিমভ

ভাষান্তর : নিরঞ্জন সিংহ

চার্লস মোদিনের বয়স চল্লিশের নিচে এবং ও'র স্বাস্থ্যও বেশ ভাল, তবু চার্লস মোদিন এখনো একবারও মহাকাশ ভ্রমণে যান নি। টিভিতে অনেক মহাকাশ উপনিবেশের ছবি দেখেছেন। মাঝে মধ্যে এইসব মহাকাশ-উপনিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু পড়েছেনও ; কিন্তু তা ওই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু নয়।

মোদিন মহাকাশ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। উনি পৃথিবীতে জন্মেছেন ; পৃথিবীর মাটিই ও'র প্রিয়। মাঝে মাঝে চলে যান সমুদ্রের ধারে, তাতে পরিবেশের একঘেয়েমীটা কেটে যায়। মোদিন একজন দক্ষ নাবিকও বটে।

তাই যখন 'স্পেস স্ট্রাকচার লিমিটেড' কোম্পানীর প্রতিনিধি জানালেন যে ওরা যে কাজটা মোদিনকে দিতে চায় সেটা করতে হলে মহাকাশ পাড়ি দিতেই হবে, তখন এ প্রস্তাবে মোদিনের মন মোটেও সায় দেয় নি।

কোম্পানীর প্রতিনিধিটি একজন মহিলা, নাম নাওমি বারোনোভা। মহিলাটির চলাফেরা দেখলেই বোঝা যায় যে উনি বহুবার বহু মহাকাশ-উপনিবেশে যাতায়াতকরেছেন।

মোদিন একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কিন্তু আপনাদের কাজ করার জন্যে আমাকে মহাকাশ-উপনিবেশেই বা ছুটতে হবে কেন ?'

'আপনি তো জানেন আমার কোম্পানী আপনাকে দিয়ে কিছু নক্সা করিয়ে নিতে চান।' বললেন বারোনোভা।

'পোষাকের নক্সা তো ?'

'পাখার নক্সা।'

'সেতো আমি এখানে বসেও করতে পারি তাই না ?'

বারোনোভা বেশ জোরদিয়ে ঘাড় নাড়লেন। 'মিঃ মোদিন আমরা চাই আপনি বাস্তব পরিবেশটা নিজের চোখে দেখুন। আমরা কমপিউটার বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে আগেই কথাবার্তা বলেছি। তাঁরা আমাদের মহাকাশ-উপনিবেশের জন্য সব থেকে উপযুক্ত পাখা তৈরী করতে প্যরবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যই তাঁদের সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও কাজ হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

'কেন ?' কথার মাঝখানে প্রশ্ন করে বসলেন মোদিন।

বাধা পেয়ে মুহূর্তের জন্যে থামলেন শ্রীমতী বারোনোভা। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'ব্যাপারটা কি জানেন, প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই পাখা হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর হবে ; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে ওই সর্বাঙ্গসুন্দর পাখাও আমাদের মহাকাশ-উপনিবেশের সব মানুষ আগ্রহের সঙ্গে পরবে না। আর তা না পরলে মহাকাশ-উপনিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেই জন্যে আমি আমার কোম্পানীকে বলেছি যাতে তাঁরা আপনাকে আমাদের মহাকাশ-উপনিবেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এর জন্য আমার কোম্পানী টাকা পয়সা খরচা করতে মোটেই কার্পণ্য করবে না।

যা হোক শেষ পর্যন্ত টাকা পয়সার আকর্ষণ এবং নিজের কাজের স্বীকৃতি পাওয়ার আনন্দ এই দুই টানে মোদিন মহাকাশ পাড়ি দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

মহাকাশযানে বসে হলোগ্রাফিক ভিডিও টেপএ কীভাবে নকল পাখা লাগিয়ে লোকেরা মহাকাশ-উপনিবেশে উড়ে বেড়াচ্ছে তার ছবি দেখে সেদিন সময় কাটাতে লাগলেন। ব্যাপারটা ও'র বেশ ভালই লাগল। শ্রীমতী বারোনোভাকে বললেন, 'এভাবে ওড়বার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ ও সৌন্দর্য্য আছে।'

শ্রীমতী বারোনোভা একটু ম্লান হেসে বললেন, 'আপনি ছবিতে যাদের উড়তে দেখছেন ও'রা হচ্ছেন দক্ষ এ্যাথলেট। আপনি যদি ওই পাখা নিয়ে আমাকে উড়তে দেখতেন তাহলে হাসি সামলাতে পারতেন না, যদিও লোকে বলে আমি নাকি ভালই উড়তে পারি।'

ওরা মহাকাশ উপনিবেশ পাঁচ এর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছেন। যদিও উপনিবেশটার সরকারী নাম 'ক্রাইসালিস' কিন্তু সবাই এটিকে উপনিবেশ-পাঁচ বলেই উল্লেখ করে।

মহাকাশ-উপনিবেশ পাঁচ চোখে পড়ল। টিভিতে পৃথিবীতে বসে যেমন দেখেছেন মোদিন। মোদিন জানেন ওটাকে ছোট দেখালে কি হবে আসলে ওটা অনেক বড়। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্লাস ও এ্যালুমিনিয়ামের এক বিশাল গোলকের চারপাশে মোদিনদের মহাকাশযান পাক খেতে লাগল। মোদিন অবাক হয়ে এই বিচিত্র বস্তুটি লক্ষ করতে লাগলেন। তারপর শ্রীমতী বারোনোভাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'আমরা এখানে নামবো তো ?

'এখানে নামব তো নিশ্চয় তবে নামাটা একটু ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। মহাকাশ-উপনিবেশ পাঁচ ওর অক্ষের উপর ঘুরছে দুমিনিটে একবার করে। এতে সৃষ্টি হচ্ছে একটা কেন্দ্রাতিগ শক্তির, যার ফলে উপনিবেশের সবকিছু আটকে থাকছে ভিতরের দেওয়ালের সঙ্গে এবং সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ। ওখানে নামবার আগে আমাদের মহাকাশযানের গতি উপনিবেশ পাঁচ এর গতির সঙ্গে সমতায় আনতে হবে। এর জন্য একটু সময় লাগবে।

মোদিন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'উপনিবেশ পাঁচ এতজোরে ঘুরছে !'

অবশেষে উপনিবেশ-পাঁচ এর একটা মেরুপ্রদেশ দিয়ে মহাকাশযানটি ভিতরে ঢুকে পড়ল।

মোদিন উপনিবেশ-পাঁচ-এ একটা পুরোদিন কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ; কিন্তু ব্যাপারটা বেশ উপভোগও করলেন। একটা সুন্দর ঘাসের লনে চেয়ারে বসেছিলেন মোদিন ও বারোনোভা। সামনে ছড়ানো শহর।

এই উপনিবেশের নিরক্ষরেখা অঞ্চলেই মানুষের বসবাস। এই অঞ্চলের গতিবেগ বেশি ও আমরা পৃথিবীর মত মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি পাই। আমরা যদি অক্ষের দিকে বা মেরুপ্রদেশের দিকে যাই তাহলে মাধ্যাকর্ষন শক্তি ভীষণ ভাবে কমে যায়। তখনই নানারকম অসুবিধে দেখা দেয়।

'এর হাত থেকে মুক্তির কি কোন রাস্তা নেই ?' জিজ্ঞাসা করলেন মোদিন।

'পুরোপুরি রেহাই পাওয়ায় কোন রাস্তা অবশ্য নেই।

তবে কম মাধ্যাকর্ষণেও বসবাস করা যায় যদি নিয়মিত ব্যায়াম করা হয়। বুঝতেই পারছেন এ ধরণের কাজ উপনিবেশের সবাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করবে একথা ভাবা যায় না। আমাদের ধারণা ওড়ার ব্যাপারটা যদি খানিকটা সহজ করে আনা যায় তাহলে বেশির ভাগ লোক আগ্রহী হবে। ওড়ার মাধ্যমে ব্যায়াম হয়ে যাবে। যখন আমরা মেরুপ্রদেশের কাছে কম মাধ্যাকর্ষণ অঞ্চলে চলে যাই তখন ভারহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন হাত নাড়িয়ে শূন্যে উঠে যাওয়া যায়। দুহাতে যদি হাল্কা প্লাস্টিকের পাখা লাগিয়ে দেওয়া যায় এবং সেই পাখা যদি ছন্দোবদ্ধভাবে নাড়ানো যায় তাহলে যে কোন মানুষ পাখির মত উড়তে পারে।

মোদিন চুপ করে কিছু ভাবতে লাগলেন।

বারোনোভা বললেন, 'আমি জানিনা আপনি ঘুমুতে পারবেন কিনা। যারা এখানে আসে তারা প্রথম কয়েকটা রাত ভাল করে ঘুমুতে পারে না। যাই হোক চেষ্টা করুন। আগামীকাল আমারা ওড়ার জায়গায় যাব।'

পরদিন মনোরেলে চড়ে বারোনোভার সঙ্গে মোদিন এসে পৌঁছুলেন মেরুপ্রদেশে ওড়ার জায়গায়। অবশ্য মনোরেলে চড়ার অভিজ্ঞতা মোদিনের মোটেও সুখকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত থামতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু পর মুহূর্তে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন কারণ মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও'র মনে হল উনি যেন শূন্যে ভেসে উঠছেন। অতি ক্ষীণ মাধ্যাকর্ষণ অঞ্চলে নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন মোদিন।

বারোনোভা মোদিনের এই অবস্থা উপভোগ করলেন ; কিন্তু তারপরই মোদিনের হাত চেপে ধরে আস্তে আস্তে টেনে আনতে লাগলেন। একটু হেসে বললেন, 'অনেকে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেন।

'আমি মোটেও উপভোগ করতে পারছি না ম্যাডাম !' বলে মোদিন হাঁফাতে লাগলেন।

উপরের আকাশে তখন পাঁচজন পাখায় ভর করে সুন্দর-ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বারোনোভা বললেন, 'এই পাঁচজন এখানে নিয়মিত আসে। আরো কয়েকশো আসে মাঝে মধ্যে। দুই মেরু প্রদেশ ও অক্ষরেখা বরাবর আমরা প্রায় হাজার পাঁচেকের মত লোককে একবারে ওড়ার জায়গা দিতে পারি। উপনিবেশ পাঁচ এর তিরিশ হাজার লোকের জন্য আমারা সব জায়গাটাই ব্যবহার করতে পারি।

মোদিন বললেন উপরে যারা উড়ছে তারা তো আর পাখি হয়ে জন্মায় নি। ওরা যদি চেষ্টা করে উড়তে শিখতে পারে, তাহলে অন্যদের না পারার কি কারণ আছে ?'

'উপরে যারা উড়ছে ওদের কোনকিছু শিখবার সহজাত ক্ষমতা আছে।' বললেন বারোনোভা।

মোদিন এবার একটু বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে

উঠলেন, 'তাই যদি হয় তাহলে আমি আর কি করতে পারে ? সহজাত ক্ষমতা তো আর সৃষ্টি করতে পারব না।'

বারোনোভা বললেন, আমরা যদি নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে এখানকান লোকদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ব্যাপারটা ঠিক রাখতে পারি তাহলে উপনিবেশ পাঁচ-এর ঘূর্ণনের গতি কমিয়ে আনতে পারি এবং ধীরে ধীরে এই উপনিবেশ সবার আপন ঘর হয়ে উঠতে পারে।'

আচ্ছা যারা উড়ছে ওদের কাউকে একটু কাছাকাছি আসতে বলবেন।' বারোনোভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন মোদিন।

বারোনোভা হাত নাড়লেন। যারা উড়ছিল তাদের মধ্যে একজন বারোনোভাকে লক্ষ করল এবং এক সুন্দর মসৃণ গতিতে নিচের দিকে অনেকটা নেমে এল। যে এল সে একজন যুবতী। দশ ফুট উপরে ভাসতে লাগল। হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে পাখা নাড়তে লাগল।

'কি ব্যাপার ?' জিজ্ঞাসা করল যুবতীটি।

'না, তেমন কিছু নয়। আমার বন্ধু দেখতে চাইছেন কিভাবে তোমরা পাখার সাহায্যে উড়ছ। ওঁকে দেখাও কিভাবে পাখা কাজ করছে।'

যুবতীটি হাসল তারপর একটা পাখা প্রথমে নাড়িয়ে, পরে অন্যটা নাড়িয়ে একটু উপরে উঠে গেল। ওর পাদুটো নড়তে লাগল, পাখারও গতি বাড়তে লাগল। তারপরই যুবতীটি অনেক উপরে উঠে গেল।

সেদিন সব ভাল করে লক্ষ করে একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'যেন ব্যালে নৃত্য। পাখাগুলো কুৎসিত।"

'সত্যি !' বারোনোভা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন মোদিনের কথার মধ্যে।

মোদিন বললেন। 'পাখাগুলো যেন বাদুড়ের পাখা। এ ব্যবস্থা একেবারে বাজে।'

'তাহলে কি করা যায় আপনিই বলুন ? পাখার উপর কি আমরা তাহলে পালক লাগিয়ে দেব যাতে দেখতে ঠিক পাখির পাখার মত দেখতে হয়। তাহলে কি যারা উড়তে চায় না তারা এসে উড়তে চাইবে ?' 'না।' প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল মোদিন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলে উঠলেন, 'খুব সম্ভবতঃ সমস্ত ব্যাপারটা আমরা অনেক সহজ করে আনতে পারি।'

কথা শেষ করে সেদিন সামান্য একটু লাফ দিতেই একেবারে বাতাসে ভাসতে লাগলেন। মোদিন হাত পা নাড়তে লাগলেন এবং বাতাসে উল্টোপাল্টা ভাসতে লাগলেন। নেমে আসার চেষ্টা করে সফল হলেন না মোদিন। বারানোভা ছুটে গিয়ে মোদিনের হাত ধরে টেনে নামিয়ে আনলেন।

মোদিন বললেন, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমার নক্সা অনুযায়ী এখানকার কেউ যদি জিনিসটা তৈরি করে দিতে পারে তাহলে আমি নিশ্চয় উড়বার চেষ্টা করব। আমি জীবনে কখনো উড়িনি। তবে আমার নক্সা অনুযায়ী জিনিসের সাহায্যে যদি আমি উড়তে পারি, তাহলে যেকেউ ওই জিনিসের সাহায্যে অত্যন্ত সহজে ও আনন্দে উড়তে পারবে।

সপ্তাহের শেষের দিকে মোদিনের মনে হতে লাগল মহাকাশ-উপনিবেশ পাঁচ যেন তাঁর নিজেরই আপন ঘর। নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাটিতে যতক্ষণ থাকছিলেন ততক্ষণ কোন অসুবিধেই ভোগ করতে হচ্ছিল না ; কারণ এখানকার কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ মোটামুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণেরই মত। তাছাড়া চারপাশের পরিবেশও যেন পৃথিবীরই মত।

মোদিন বারোনোভাকে বললেন, 'প্রথম যেদিন আমি উড়ব সেদিন সবার সামনে উড়তে চাই না ; কারণ কোন একটা গণ্ডোগোল হলে তা মুহূর্তে চাউর হয়ে যাবে এখানে এবং ব্যাপারটা মোটেও আকাঙ্ক্ষিত নয়। তবে এই উপ-নিবেশের কিছু সরকারী কর্মচারীর সামনে আমি পরীক্ষা দিতে রাজী আছি।'

'তবে যদি সাফল্য আসে তাহলে মানুষের মনে একটা সাংঘাতিক ছাপ ফেলবে।' বললেন মোদিন।

'সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি ?'

'সম্ভাবনা যথেষ্ট। আপনারা এখানে এতদিন যা করে এসেছেন তা সব ভুল। আপনারা বাতাসে পাখির মত উড়তে চেয়েছেন। আপনি নিজেই বলেছেন যে পৃথিবীতে পাখিরা উড়ে বেড়ায় স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে। কিন্তু এখানকার পাখিরা ওড়ে মাধ্যাকর্ষণ শূন্য জায়গায়। সুতরাং সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।' থামলেন মোদিন।

বাতাসে আজ কোন মানুষ পাখি উড়ছে না। সামান্য দর্শক, কো-অর্ডিনেটর, স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব, সুরক্ষা বিভাগের কমিশনার ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল জনা বারো স্ত্রী-পুরুষ। এঁদের সবার মধ্যে একমাত্র পরিচিত মুখ হচ্ছে বারোনোভার।

মোদিনের মুখের সামনে লাগানো রয়েছে একটা ছোট্ট মাইক্রোফোন।

সেদিন দর্শক মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন, 'আমারা এখানে এই উপনিবেশ পাঁচ এ উড়ছি যেখানে মাধ্যাকর্ষণ প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে বাদুড় বা পাখি আমাদের আদর্শ হতে পারে না। কারণ তারা ওড়ে মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে। সমুদ্রে কিন্তু ব্যাপারটা একদম আলাদা। জলের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের কার্যকরী ক্ষমতা

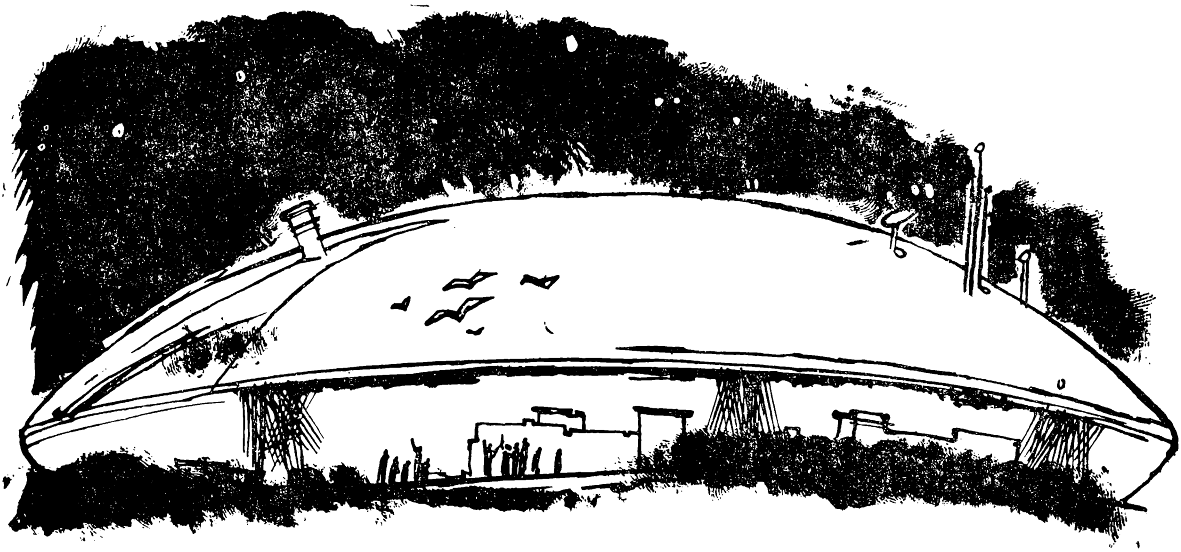

যথেষ্ট কম, কারণ জলের মধ্যে মানুষের দেহ ভেসে থাকতে চায় জলের বিশেষ ধর্মের জন্য, ইংরেজীতে যাকে বলে buoyancy। যখন আমরা মাধ্যাকর্ষণহীন জলের মধ্যে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা করি তাকে ওড়া বলে না বলে সাঁতার দেওয়া। এই মহাকাশ উপনিবেশ পাঁচ এ যেখানে এই অঞ্চলে কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই, সেখানে বাতাসের ভিতর না উড়ে বাতাসের ভিতর সাঁতার কাটতে হবে। আমরা ডলফিনকে নকল করব, ঈগলকে নয়।'

কথা বলতে বলতে মোদিন সামান্য লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়লেন। ও'র পরণে এক কাপড়ের সুন্দর পোষাক। পোষাকটি একেবারে ঢলঢলেও নয় আবার চামড়ার সঙ্গে চেপে লাগানোও নয়। প্রথমে মোদিন শূন্যে উঠে একটু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত টানটান করে দিয়ে একটা গ্যাস কার্টি'জ চালু করে দিলেন। শিরদাঁড়ার উপর বেরিয়ে এল ডলফিনের পিঠের পাখার মত একটা কৃত্রিম পাখনা।

সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য ফিরে পেলেন মোদিন।

মোদিন নিজেই বুঝতে পারছিলেন যে তিনি বেশ সহজে এবং শিল্পী সুলভ ভাবে মসৃণ গতিতে বাতাসে সাঁতার কাটছেন। ধীরে ধীরে অনেক উঁচুতে উঠে গেলেন মোদিন। বাতাসের ঝাপটা গায়ে লাগতেই একটু ভয় পেয়ে গেলেন মোদিন, কারণ তাঁর গতিবেগ বেশ বেড়ে গেছে / ভাবলেন গতি কমাতে পারবেন তো ? সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালী আর কনুই ঘুরিয়ে ফেললেন প্রয়োজনমত—ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলেন মোদিন।

হাততালিতে ভরে গেল জায়গাটি।

বারোনোভা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা আপনি কি করে সম্ভব করে তুললেন যখন আমাদের প্রযুক্তিবিদরা অসফল হল ?'

'আপনাদের প্রযুক্তিবিদরা পাখার ধারণা নিয়েই তাদের কাজ শুরু করেছিল। তারা পাখি, উড়োজাহাজকে তাদের চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল এবং সেই ভাবেই তারা সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেছিল।

বারোনোভা বললেন, 'আমরা এই ডলফিন স্যুট তৈরী করাবো এবং উপনিবেশ পাঁচ-এর সব লোককে বাইরে এনে বাতাস সাঁতারের মাধ্যমে নিয়মিত ব্যায়াম করাতে পারব। এবং তারপর উপনিবেশ পাঁচ-এর ঘূর্ণনকে কমাবার পরিকল্পনা হাতে নিতে পারব।

'থামানো কেন একেবারে থামিয়েও দিতে পারবেন, হাসতে হাসতে বলে উঠলেন মোদিন, কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে এবার এই উপনিবেশের সবাই হাঁটার বদলে সব সময় বাতাসের মধ্যে সাঁতার দিতেই বেশি পছন্দ করবে। হয়তো আর তারা কোনদিনই হাঁটতে চাইবে না। অন্ততঃ আমি তো চাইব না।'

বারোনোভার কোম্পানী একটা বিশাল অঙ্কের চেক মোদিনের হাতে তুলে নিলেন। টাকার অংকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মোদিন বললেন, পাখা হচ্ছে পাখিদের জন্য।'

7/4 W2C Ph-II, গলফ্ গ্রীন, কলকাতা-45

(18 পৃষ্ঠার পর)

রশ্মির সাহায্যে অক্ষিপটকে 'তথেও' করে এই রোগ নিরাময় করতে পারেন।

জীববিজ্ঞানে লেসার রশ্মির প্রয়োগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে এখনও তা পরীক্ষামূলক স্তরেই রয়েছে।

শিল্পকার্যে ঃ লেসার রশ্মির তীব্রতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পকার্যে বিরাট কার্য করা যেতে পারে। এই রশ্মির সাহায্যে হীরার মত কঠিন পদার্থেও ছিদ্র করা সম্ভব। এছাড়াও ওয়েল্ডিংএর কাজ বা কংক্রীট, ইট প্রভৃতিতেও ছিদ্র করা যেতে পারে।

লেসার রশ্মি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হওয়ায় এই রশ্মির সাহায্যে সূক্ষ্ম মাপজোকের কাজ চলতে পারে। কারখানাতে উৎপাদিত যন্ত্রাদির নৈপুণ্য বা নিখুঁততা কতটুকু হয়েছে তাও লেসারের মাধ্যমে অতি সহজেই করা যেতে পারে।

হলোগ্রাফিতে ঃ লেসারের সুসঙ্গত (Coherence) কে কাজে লাগিয়ে আমরা হলোগ্রাফি করতে পারি। ফটোগ্রাফির মতো হলোগ্রাফিতেও বস্তুর প্রতিকৃতিকেই রেকর্ড করা হয়। এখন তো 3—D বা, ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্র ভারতেও হচ্ছে—আর এই ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার উপায়ই হ'ল হলোগ্রাফি। সাধারণ চোখে আমরা কোন বস্তুরই

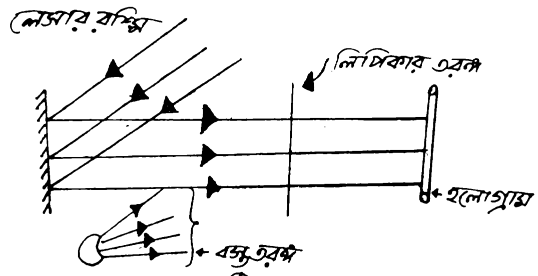

হলোগ্রামে রেকর্ডিং পদ্ধতি

সবটুকু দেখতে পাব না—এক দিক থেকে এক রকম দেখি, আর অন্যদিক থেকে আলাদা, কারণ আমাদের চোখের দৃষ্টিও দ্বিমাত্রিক। ফটোগ্রাফির মতো হলোগ্রাফিতে সরাসরি বস্তুর প্রতিবিম্ব রেকর্ড করা হয় না। বস্তু থেকে যে আলোক-তরঙ্গ নিসৃত হয় তাকেই কেবল বিধৃত করে রাখা হয়। একে বলা হচ্ছে রেকর্ডিং এবং দ্বিতীয় ধাপ হ'ল পুর্ণগঠন (Reconstraction)। আলোকের দুটি ধর্মকে এই দুটি ধাপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে আলোকের ব্যাতিচার (interference) এবং দ্বিতীয় ধাপে অলোকের অপবর্তন (diffraction) কে কাজে লাগানো হয়। প্রথম ধাপে বস্তু তরঙ্গকে রেকর্ড করতে হলে ঐ তরঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বিস্তার (Amplitude) এবং দশা (phase) রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হয়। ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে তীব্রতাকে রেকর্ড করা গেলেও বস্তু তরঙ্গের দশাকে রেকর্ড করা সম্ভব নয়—তাই আলোকের ব্যাতিচারকে কাজে লাগানো হয়। এর ফলে রেকর্ড-এর ক্ষেত্রে এক ব্যাতিচার নক্সা দেখা যায়, একেই বলে হলোগ্রাম। হলোগ্রাম প্লেট টুকরো টুকরোও হয়ে যায় তবেও প্রতিটি টুকরো থেকে একটি পুরো বস্তুর ছবি পাওয়া যাবে। ব্যাতিচারের জন্য একবর্ণী ও সুসংগত (Coherent) আলোকতরঙ্গের প্রয়োজন যার জন্য লেসার রশ্মি অপরিহার্য। আর যে রশ্মিকে সরাসরি ফেলা হয় তাকে বলে 'রেফারেন্স বীম'। পরে আলোকের অপবর্তনকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণগঠনের কাজ সারা হয়। হলোগ্রামের নীতির উপর ভিত্তি করেই অতি স্বল্প পরিসরে বিপুল পরিমানে তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব একেই বলা হয় আলোকীর তথ্য সঞ্চয় ব্যবস্থা (OPTICAL DATA STORAGE SYSTEM)

যোগাযোগ মাধ্যম ঃ যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারেও লেসারের ভূমিকা আছে। বেতার যোগাযোগে লেসারের থেকে বড় মাধ্যম বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না। আজকাল সংবাদ পরিবহনের জন্য যে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় তার থেকেও লেসারের কম্পাঙ্ক বেশি। লেসার ডায়োডের সাহায্যে ফোনকল বা ব্যবসায়িক তথ্য মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক স্থান থেকে আরেকস্থানে পৌঁছে যাবে। লেসার শ্রুতিযন্ত্রের (Memory System) সাহায্যে 8000 পৃষ্ঠা মাত্র 12 ইঞ্চির একটি রেকর্ডে সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব। লেসার রশ্মি প্রিন্টার একটি চিঠি মাত্র 5 সেকেণ্ডেই শেষ করতে সক্ষম।

পরিবেশ দূষণ রোধে ঃ পরিবেশ দূষণ আমাদের কাছে এখন এক জাজ্জ্বল্যমান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে লেসারের ভূমিকা এখন পরীক্ষা মূলক স্তরে রয়েছে। বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইডের অনুপ্রবেশ ঘটল কিনা তা যখন দেখা দরকার তখন আমরা দূর থেকে লেসার রশ্মি পাঠিয়ে ইলেকট্রনিক মন্ত্রের সাহায্যে তার তীব্রতা মেপে দূষণে'র পরিমান নির্ণয় করতে পারব যা থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

কমপিউটারে ঃ আর একটি জিনিস এখনও গবেষণার পর্যায়ে আছে তা হ'ল কমপিউটারে লেসারের ব্যবহার। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা Optical Comupter দেখতে পাব যার মাধ্যমে আলোর সমবেগে কমপিউটারে বিভিন্ন অংশের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান ঘটবে।

এখানে অনেকগুলি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করলাম। ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেক কাজে লেসার রশ্মিকে ব্যবহার করা যাবে যেগুলিকে অবশ্যই মানব কল্যানে নিয়োজিত হবে।

'মডেল' এর রকমফের

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র

সেনসেটিভ ভোল্ট মিটার

ইলেকট্রনিক মডেল করতে গেলে প্রধান প্রয়োজন সুবেদী বা Sensetive মিটারের, এ ধরনের মিটার কিনতে গেলে বাজারে দাম পড়ে প্রচুর। তাই একটা সাদা মাটা মিটারকে কিভাবে তোমরা সহজেই কাজ চালানোর মতো সুবেদী করে তুলতে পারবে তার একটা সার্কিট তোমাদের দিচ্ছি।

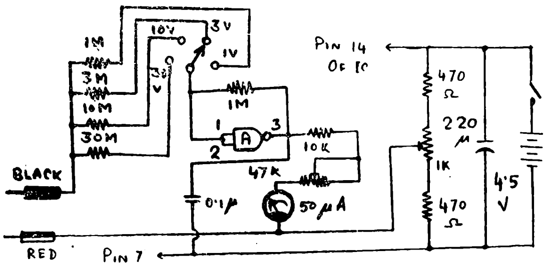

Circuit diagram লক্ষ্য করে দেখ. ওখানে একটা সাধারন 50µA মিটার ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা Voltmeter হিসাবে কাজে লাগাব। CMOS Gate-এর input impedence অত্যন্ত বেশি বলে এই মিটারেরও input impedence খুব বেশি হবে। সার্কিটে একটা মাত্র Gate ব্যবহার করা হয়েছে Linear amplifier হিসাবে। বাকী Gate গুলো তোমরা অন্য কাজে লাগাতে পারো। Input-prod বা measuring prod দুটিতে কোন Potential difference না থাকলে Gate এর Output হবে supply voltage এর অর্ধেক। তাই পোটেনশিওমিটার (1k) ঘুরিয়ে ওটা ব্যালেন্স করার ব্যবস্থা সার্কিটে আছে। মিটারের prod দুটোতে জানা Voltage দিয়ে 47KΩ potentiometer ঘুরিয়ে মিটার Calibrate করা যাবে।

CMOS-Ic দিয়ে সার্কিট করার সময় কতগুলো বিষয় খেয়াল রাখবে। Ic এর পিনে হাত না লাগানোই ভাল। Ic-এর জন্য Base ব্যবহার করবে। কাছাকাছি Static Charge জমা হতে পারে এমন কোন জায়গাতে CMOS Ic রাখবে না।

গ্রাম + পোস্ট : চামরাইল, জেলা : হাওড়া—711323

ভ্রম সংশোধন

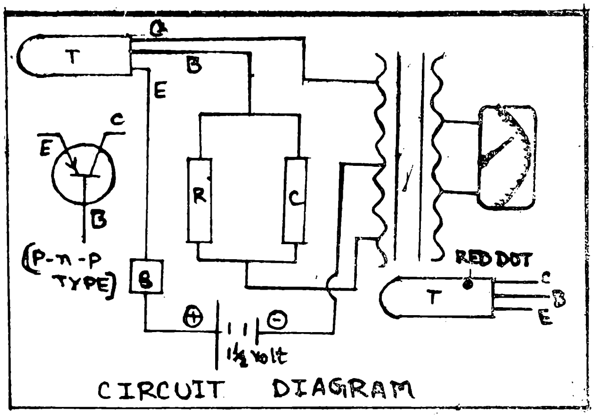

ডিসেম্বর '88' সংখ্যায় প্রকাশিত দেবকুমার রায়ের কম খরচে হাইভোল্টে বা মডেলটিতে অনিবার্য কারণ বশত কিছু ভুল থাকায় বহু আগ্রহী মডেল নির্মাতার অনুরোধে নির্ভুল সার্কিট ডায়াগ্রামটি প্রকাশিত হলো। এখানে 16 watt-এর ল্যাম্পের বদলে ভোল্টমিটার দিয়ে মাপলে হাই ভোল্টেজ উৎপন্ন হতে দেখা যাবে, কারণ হাই ভোল্টেজ উৎপাদনই মডেলটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য। এখানে ল্যাম্পকে কোনমতেই জ্বালানো সম্ভব নয়। আশাকরি মাডল এর নির্ভুল সার্কিট ডায়াগ্রাম পেয়ে ও তথ্য জেনে অনেকে খুশি হবেন।

10/3এ, শত্রুঘ্ন ঘোষ লেন, কলিকাতা-700012

মডেল বানাতে গিয়ে ঃ দুই

রাজেশ গিরি

IC555 দিয়ে কোন সার্কিট বানাতে গেলে প্রথমেই আমাদের উচিৎ IC555 সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কিছু জেনে নেওয়া। IC শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তবুও IC সম্বন্ধে দু কথা বলা যাক। IC কথাটির অর্থ হল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (Integrated Circuit) অর্থাৎ অনেকগুলি Domponents (যেমন-ট্রানজিস্টার, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ডায়োড ইত্যাদি) দ্বারা গঠিত একটি সার্কিটের সম্পূর্ণ অংশ। এই রকম অনেকগুলি সার্কিট (IC) নিয়ে একটি প্রধান সার্কিট গড়ে তোলা যায়। কিম্বা এই রকম একটা সার্কিট (IC)-এর সঙ্গে সামান্য দু একটা যন্ত্রাংশ (Components) জুড়ে নিয়ে বিভিন্ন সার্কিট বানানো করা হয় তবে তার আয়তন হবে একটা ছোট খাট ঘরের সমান, ফলে এর ওজনও বেশি হবে। এবং অসংখ্য যন্ত্রাংশ ব্যবহার করায় তার দামও যে অনেক বেশি হবে তা বুঝতে নিশ্চয় কোন অসুবিধা নেই। সেখানে IC555-এর দাম 5 টাকা সেখানে ওকে ডায়োড ট্রানজিস্টর ও রেজিস্টর দিয়ে বানালে তার দাম হত প্রায় 100 টাকা!

IC555 হল মূলতঃ একটা টাইমার সার্কিট। এই ICটা অনেক কাজ করতে পারে তাই বিভিন্ন সার্কিটে এর ব্যবহার আছে। কাজের সুবিধার জন্য এই ICর পিনগুলোর প্রকৃতি জেনে রাখা দরকার। এর 1নং পিন→গ্রাউণ্ড অর্থাৎ নেগেটিভ সাপ্লাই; 2নং পিন→ট্রিগার; 3নং পিন→

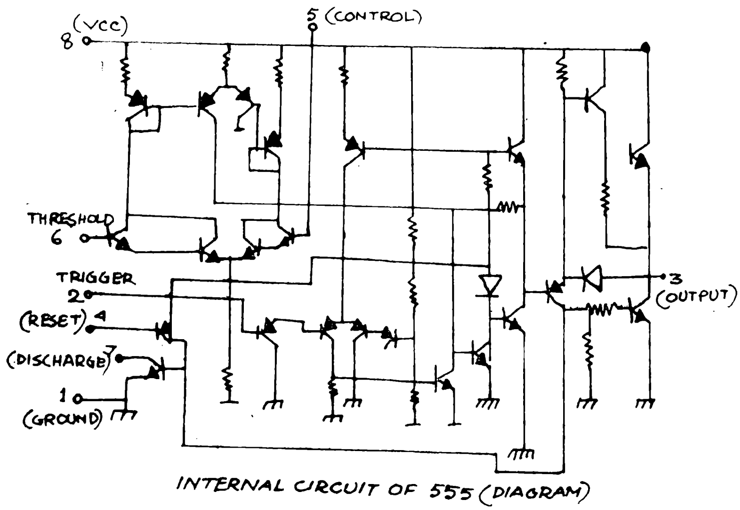

অভ্যন্তরীন সার্কিট ডায়াগ্রাম

যায়। যেমন একটা IC555 এর সঙ্গে দুটো ডায়োড, একটা ক্যাপাসিটর, একটা রেজিস্টর ও একটা রিলে জুড়ে নিয়ে 'চোর তাড়ুয়া' তৈরি হয়েছে। তবে ICর ভেতরে কিন্তু কয়েল, ট্রানস্ফরমার ইত্যাদি রাখা যায় না। একটা ছোট ICর ভেতরে বড় বড় সার্কিট ঢুকিয়ে দিতে পারার ফলে আমরা অনেক সুবিধা পাই, যেমন—এর ওজন, আয়তন এবং সর্বোপরি এর খরচ খুব কম হয়। যদি একটা T.V.তে IC ব্যবহার না করে ঐ সার্কিট অন্যান্য যন্ত্রাংশ দ্বারা তৈরি আউটপুট; 4নং পিন→রিসেট; 5নং পিন→কন্ট্রোল; 6নং পিন→থ্রেস্হোল্ড; 7নং পিন→ডিসচার্জ; 8নং পিন→পজিটিভ সাপ্লাই। এই IC দ্বারা কোন সার্কিট বানাতে গেলে তার কার্য পদ্ধতি সার্কিটটির আভ্যন্তরীন সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বুঝে নিলে তা বানাতে খুব সুবিধা হবে!

ঘোড়াধরা—ঝাড়গ্রাম—মেদিনীপুর-721507

আঁকার অঙ্ক শিখে

অরুণ সাহা

তোমরা যারা নিয়মিত পড়াশুনা কর তারা হয়ত অনেকেই দেখেছ যে বৃত্তসংক্রান্ত বা বহুভুজ সংক্রান্ত দুটি ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই থাকে। প্রশ্ন দুটি হল —(1) কতগুলি বৃত্ত যদি পরস্পরকে ছেদ করে, তবে মোট ক'টি ছেদ বিন্দু পাওয়া যাবে ? (2) নির্দিষ্ট বাহু সংখ্যা-বিশিষ্ট একটি বহুভুজের মোট বাহুসংখ্যা কত ? উভয় ক্ষেত্রেই যদি বৃত্ত বা বাহুসংখ্যা 4 থেকে 5 এর মধ্যে হয়, তবে সহজেই ছবি এঁকে, গুনে বলা যায়। তবে ধর, সংখ্যাটি 9 বা 10 হল, বা 19 বা 20 হল, তবে ? চিন্তার কোন কারণ নেই, দেখবে এই লেখা পড়ার পর সব জলের মত সোজা হয়ে যাবে। তবে সবার আগে একটা পুরোনো ধাঁধায় চল। তাহলে শুরুতেই ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হবে না। ধাঁধাটা হল—কিছু সংখ্যক লোক যদি পরস্পর পরস্পরের সাথে করমর্দন করে, তবে মোট ক'বার করমর্দন করা হবে। এখানেও ব্যক্তিসংখ্যা 4 থেকে 5 এর মধ্যে হলে গুনে বলা যায়, কিন্তু সংখ্যা 15 বা 20 হলে ? উত্তরটা হবে—প্রশ্নে যতগুলি লোকের কথা উল্লেখ থাকবে সেই সংখ্যাটা বাদে তার আগের সংখ্যা পর্যন্ত 1 থেকে পরপর সংখ্যাগুলো বসিয়ে যোগ করে দাও। দেখবে উত্তর তৈরি। ঠিক আছে, করেই দেখাই,—মনে কর লোকসংখ্যা 10, তবে মোট করমর্দন সংখ্যা হবে—

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ বার।

এবার এস বৃত্তের অঙ্কে। মনে কর প্রশ্নে আছে 8টি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করল, তবে মোট ছেদবিন্দুর সংখ্যা হবে—

$0+2+4+6+8+10+12+14=56$টি।

অর্থাৎ মোট য'টি বৃত্ত থাকবে, 0 থেকে শুরু করে ততটি সংখ্যা এমনভাবে বসিয়ে যোগ করবে যাতে প্রতিটি সংখ্যার মান পূর্ববর্তী সংখ্যার চেয়ে 2 বেশি হবে।

এবার আমি শেষ প্রশ্নে—যদি কোন বহুভুজের বাহু-সংখ্যা n হয়, [n = যে কোন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা] তবে তার মোট কর্ণ সংখ্যা কত ? সূত্রটি হল—

$2(n-3)+(n-4)+(n-5)+(n-6)$ এইরূপে যতক্ষণ না বিয়োগফল 0 হয়। অতঃপর মোট সংখ্যার যোগফলই হবে উত্তর। একটা উদহরণ দিই —ঃ মনে কর বাহুসংখ্যা 14, তবে কর্ণ সংখ্যা হবে—

$$2(14-3)+(14-4)+(14-5)+(14-6)+(14-7)+(14-8)+(14-9)+(14-10)+(14-11)+(14-12)+(14-13)+(14-14)$$

$$=22+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+0=77.$$

আশা করছি সূত্রগুলি তোমাদের যথাযথ ভাবে বোঝাতে পেরেছি। এবার নিশ্চয়ই আর আগের মত বড় সংখ্যা দেখলে ভয় পাবে না। তবে একটা কথা, সূত্রগুলি কি করে এল বলতে পার ? নাঃ, এবার আর বলছি না—নিজেরাই বার করার চেষ্টা কর।

দশম শ্রেণী / বি-জোন বালক উচ্চ বিদ্যালয় / দুর্গাপুর-৫

সুন্দর
ও মজবুত
জুতো মানেই
রাদু

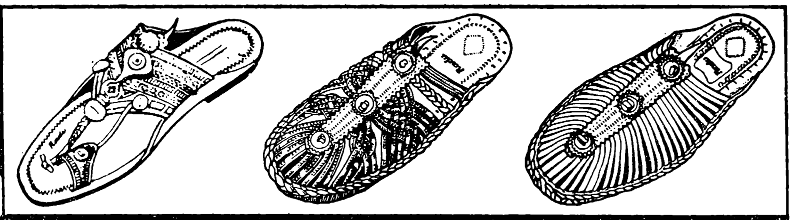

Radu®
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
ESTD. 1901
75A, COLLEGE STREET CALCUTTA-700 073
PHONE: 31-2402
18, GARIAHAT ROAD, CALCUTTA-700 019
PHONE 42-8393

সাদা চাঁপা

এনাক্ষী বিশ্বাস

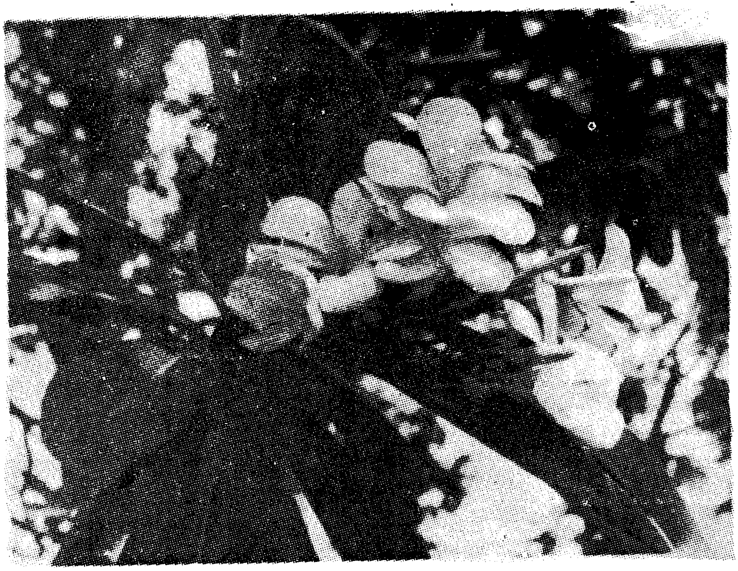

শীতের হিমেল হাওয়ার পরশটুকু হারিয়ে যাবার সাথে সাথে গাছের শাখার প্রান্তে গুচ্ছ-গুচ্ছ সাদা ফুলের আবির্ভাব পরিবেশকে করে তোলে মনোরম। কেবল তার স্নিগ্ধ রূপের লাবণ্য পথিকজনের মন আকৃষ্টই করে না ; তার সাথে বাতাসে মিশিয়ে দেয় মিষ্টি সুবাস। যে সুবাস রাতের অন্ধকারে সকলকে জানিয়ে দেয় তার উপস্থিতি। গ্রামে-গঞ্জে লোকে এই সুবাসিত ফুলের মালা করে গলায় পড়ে।

এই উদ্ভিদটি চিরসবুজ। সারা বছরই সারা গাছে পাতায় ভরে থাকে। এর উচ্চতা প্রায় চার থেকে সাড়ে চার মিটার। পাতাগুলি গাঢ় সবুজ, মসৃণ, বিডিম্বাকার। বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত। এই উদ্ভিদটির পাতা শাখা-প্রশাখা চ্যুত করলে দুধের মত পদার্থ বহিঃক্ষরিত হতে থাকে। ইহা তরুক্ষীর নামে পরিচিত। ইংরাজীতে ল্যাটেক্স বলে। এই উদ্ভিদটির দেহে বিশেষ রকমের কলা আছে। যেগুলি থেকে নানাপ্রকার পদার্থ নিসংরিত বা বহিঃক্ষরিত হয়। এই ধরনের কোষগুলিকে বলে ক্ষীরকোষ। ইংরাজীতে বলে Latex Cell। এই কোষগুলি এককোষী। কোষটি ছোট থেকে ক্রমশঃ বড় ও লম্বা হয় এবং অবশেষে অনেক শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন করে। এই শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে এলেও কখনও সংযুক্ত হয় না। এই কোষগুলি সজীব ও নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়।

এই তরুক্ষীর ভেষজ-গুণ সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ ক্ষত ও বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগে ফলপ্রদ।

ইহা অ্যাপোসাইনেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্ষীর কোষের উপস্থিতি।

ফুলের পাঁচটি ছোট আকৃতির বৃতি থাকে। 5টি সাদা রঙের পাঁপড়ি নিচের দিকে যুক্ত থাকে কিন্তু ওপর দিকে বিস্তৃত হয় এবং পাঁপড়ির অগ্রভাগ গোলাকার হয়। 5টি পুংকেশর পাঁপড়িগুলির গায়ে বিন্যস্ত থাকে। এই ধরণের পুংকেশরকে ইংরাজীতে এপিপেটালাস ষ্ট্যামেন বলে। ফল ফলিকল হয়। অর্থাৎ ফলগুলি দুই বা ততোধিক মুক্ত গর্ভপত্র হতে জন্মে। ইহারা ওপর বা নীচের দিকে সামান্য যুক্ত থাকে এবং পরিপক্ক হলে আপনা হতেই একটি প্রান্ত ফাটিয়া গিয়া বীজ ছড়াইয়া পড়ে। এই ফল আমেরিকার আদিবাসীরা ভক্ষণ করে। বীজ গুলির মধ্যে রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করার বিশেষ গুণ বর্তমান।

এই উদ্ভিদটি সর্বপ্রথম লিনিয়াস বর্ণনা করেন। নামকরণ করেন **প্লুমেরিয়া এলবা**। গণের নামকরণ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী চার্লস প্লুমায়ার (Charles Plumier 1646—1706) নামে হয়। আর প্রজাতির নামকরণ এলবা ফুলের রঙ অনুসারে হয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় এলবা কথার অর্থ সাদা। প্রকৃতই দেখা যায় এই উদ্ভিদটির ফুলটি দুধ সাদা রঙের।

প্লুমেরিয়া গণের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদগুলির প্রজাতি নির্ণয় করা হয় পাতার আকৃতি ও ফুলের পাঁপড়ির রঙের ওপর ভিত্তি করে। এই গণের প্রায় 45টি প্রজাতি আছে।

এই গণের উদ্ভিদগুলির আদিনিবাস দেখা যায় আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে। বিশেষতঃ উপরে বর্ণিত উদ্ভিদটি আমেরিকার মেক্সিকোয় জন্মস্থান। বর্তমানে ভারত-ভূমিতে সে তার নিজের স্থান করে নিয়েছে।

ছবি: সুবল কৃষ্ণ দে

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

মে '89 VII-VIII

1. সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতি বছর কোন দিন 'অক্টোবর বিপ্লব স্মরণ দিবস' উদযাপিত হয় ?

2. কলেরা রোগজীবাণুর আবিষ্কর্তার নাম কি ?

3. মোয়া এবং ডোডো পাখি পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে বর্তমানে দেখা যায়।

4. বিহারের গোমিয়ায় কিসের কারখানা আছে ?

5. এটি কিসের ছবি ?

6. হাঁটার প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কোনটি ?

7 আঁদ্রে মেরী অ্যাম্পিয়ার কোন্ দেশের পদার্থ বিজ্ঞানী ?

8. কে প্রথম উড়োজাহাজে চড়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেছিলেন ?

9. বিশ্বের বৃহত্তম কোন্ মসজিদ আজও ব্যবহৃত হয় ?

10. মারাঠী দৈনিক সংবাদপত্র কেশরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

11. ভারতে দীর্ঘতম দিন কোন্‌টি।

12. ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ কোন্‌টি ?

গ্রেড II

মে '89 IX-X

1. 'ফ্লেমিশ' কোন্ দেশের সরকারী ভাষা ?

2. পূর্বজার্মানীর সঠিক নাম কি ?

3. বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম প্রাণি কোন্‌টি ?

4. সোনা এবং রূপার দণ্ডকে কি বলা হয় ?

5. এটি কোন কারখানার ছবি ?

6. মাউথ অর্গানের আবিষ্কর্তা কে?

7. ব্রিটেনের প্রথম পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো জাহাজের নাম কি ?

8. মেট্রিক পদ্ধতিতে 100 বর্গমিটারকে কোন্ এককে প্রকাশ করা হয় ?

9. P.B.X. বলতে কি বোঝায় ?

10. কোন্ তারিখে প্রতি বছর শিক্ষক দিবস পালিত হয় ?

11. I.N.S. কথার অর্থ কি ?

12. কোন্ পাখি নিজে বাসা বাঁধে না ?

গ্রেড III

মে '89 XI-XII

1. SUNETTE কি ?

2. কোষের পাওয়ার হাউস বলা হয় কাকে ?

3, Organismদের শ্রেণীবিভাগ করার বিজ্ঞানকে কি বলা হয় ?

4. একটি দণ্ড চুম্বককে যদি একটি ধাতব রিং-এর মধ্যে দিয়ে মুক্ত অবস্থায় পড়তে দেওয়া হয়, তবে তার ত্বরণ বাড়বে না কমবে ?

5. হাইড্রোজেনের কোন্ আইসোটোপটি তেজস্ক্রিয় ?

6. 1975 খ্রীষ্টাব্দের 'প্রুডেনসিয়াল কাপ' বিজেতাদের কতো অর্থ পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল ?

7. A যদি B এর দ্বিগুণ পায় এবং B যদি C এর তিনগুণ অধিক পায়, তবে 660 টাকার কতো ভাগ C পাবে ?

8. প্রতি বছর জাতীয় সংহতি দিবস পালিত হয় কবে ?

9. অজন্তা গুহায় কোন্ কাহিনী চিত্রিত আছে ?

10. লবঙ্গ ফুল না ফল ?

11. 'কোনাডা কাপ' এর সঙ্গে কোন্ খেলার নাম জড়িত ?

12. এই যন্ত্রটি কি কাজে লাগে ?

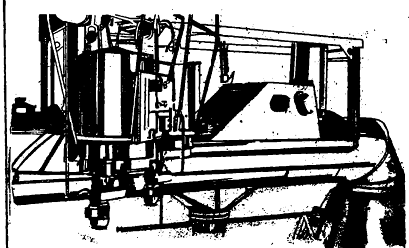

শাশ্বতী কুণ্ডু

পাশাপাশি ঃ

2. একই ধর্মের জিনজোড়া। 5. বানরের অন্য নাম। 7. শালবৃক্ষের রেচন পদার্থ। 8. পারদ এই নামে পরিচিত। 9. মাটির নীচের উদ্ভিদের অংশ। 10. তুলা, সিংহ এগুলি আসলে—। 14. জন্ম থাকলেই যা থাকবে।

উপর নিচ ঃ

1. উড়িষ্যার পূর্বের রাজধানী। 2. — বেসান্ত। 3. ধ্বংস ইত্যাদি। 4. শ্রীলংকার তামিল এলাকা। 6. মহাকাশ থেকে যে আগুনের পিণ্ড আসে। 7. সম্পূর্ণ ফুল। 9. 'মূর্তি'র সরল রূপ। 11. শীতকালের একটি অতিপরিচিত দৃশ্য। 12. 'রসাল' যা সাধারণ ভাবে এই নামেই পরিচিত। 13. শরীরও হবে; ওজনের এককও হবে।

ইটিণ্ডা, 24-পরগণা (উঃ)

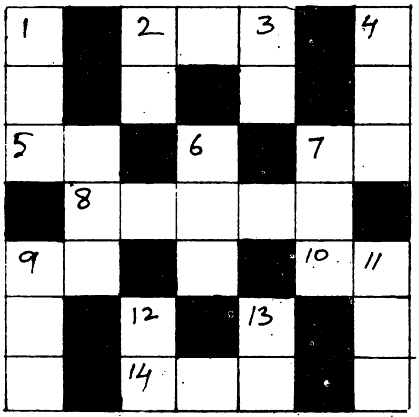

আই-কিউ-টেস্ট / মে 1989

1. পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে?
   2 5 9 19 37—?
2. পরিবর্তী প্রবাহকে সমপ্রবাহে রূপান্তরিত করতে যেটি ব্যবহার করা হয়, সেটি হলো—
   (a) পরিবর্তিত, (b) হুইট্‌ স্টোন জালক, (c) ডায়োড, (d) বিভবমাপী।
3. ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় যে অভয়ারণ্যটি আছে, তার নাম কি?
4. পাকর্মিনিয়া গ্রামিনিস' ক্ষতি করে—
   (a) ছোলার, (b) আলুর, (c) গমের, (d) ধানের।
5. নিচের কোনটি ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌল?
   (a) জার্মেনিয়াম, (b) বেরিয়াম, (c) রুবিডিয়াম।

মার্চ 1989 ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সমাধান

1. বৃহত্তম $\frac{4}{5}$ এবং ক্ষুদ্রতম $\frac{1}{3}$। 2. পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক থেকে বেশি সুদ পাবেন। 3. দহন। 4. ল্যাকটোব্যাসিলি। 5. সরলাক্ষি। 6. 7·4 gm/c.c.। 7. Carl Beng. 8. লরীকে সহজে থামানো যাবে। 9. রবার্ট বয়েল। 10. সবুজাভ হলুদে।

মার্চ 1989 ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সমাধান

1. ঘোড় দৌড়। 2. DAIMBLER। 3. USSR 55টি। 4. ওথেলো। 5. 622 খ্রীষ্টাব্দে। 8. দিলীপ বেঙ্গসরকার। 9. মহম্মদ বিন তুঘলক। 10. ক্রিকেট।

মার্চ 1989 ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সমাধান

1. সাংহাই। 2. মোজাম্বিক। 3. রাঁচিতে। 4. ঐ তারিখে U. N. O. স্থাপিত হয়। 5. ফরাসী ভাষায়। 6. নতুন দিল্লী। 7. শ্রীহরিকোটা। 8. Reliance Cup। 9. চেকোস্লোভাকিয়া। 10. জৈন ধর্ম।

আই-কিউ-টেস্ট/মার্চ '89 এর সমাধান

1. 2556। 2. (a) ইয়ার। 3. (c) স্থূলকোণ। 4. (a) অ্যামোনিয়া। 5. Central Food Technological Research Iustitute.

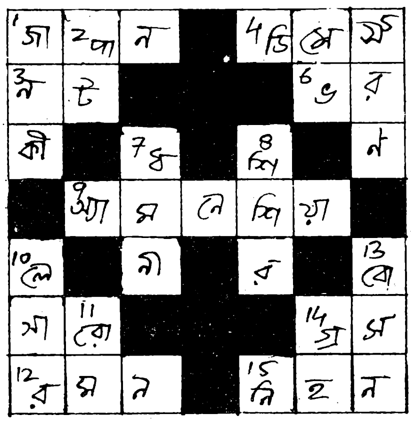

হার্টফেল

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

আমাকে হিমাংশু সেদিন বোঝাচ্ছিলো কত সামান্য আঘাতে এমন কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মানুষ মারা যেতে পারে। হিমাংশু ডাক্তার। তাই ওর বক্তব্যের দাম আছে। একটা গল্পও বলেছিলো। ঘটনাটা নাকি সত্যি।

বসিরহাটের ছেলে বাদল চীন-ভারতের যুদ্ধের সময় যুদ্ধে গিয়েছিলো। তখন মিলিটারিতে অনেক যুবক নাম লিখিয়েছিলো এবং অল্প ট্রেনিং নিয়েই যুদ্ধে যেতে হচ্ছিলো। বাদল যুদ্ধ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। কলকাতায় আসার আগেই মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় কবে বসিরহাটে ফিরবে।

বাদলের মা বুড়ি মানুষ। বাদল তার একমাত্র ছেলে। ছেলে বাড়ি ফিরছে এই আনন্দে মায়ের চোখে ঘুম নেই। নির্ধারিত দিনে বুড়ি মা নানান রকম খাবার দাবার বানিয়ে, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে ছেলের জন্য ছটফট করছে। রাত আটটার ট্রেনে আসার কথা। ট্রেনটা লেট করে এলো রাত দেড়টায়। তবুও শেষ পর্যন্ত ছেলে ফিরলো। মা বুকে জড়িয়ে ধরলো বাদলকে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে রাত প্রায় শেষ। বাদল ঘুমোতে যাবে। মা বলল—'তুই বরং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমো, আমি আর এইটুকু রাত শোবো না।

বাদল মায়ের কোলে মাথা রেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। মা একটা সোয়েটার বুনছিলো কদিন ধরে সেটাই বুনতে থাকলো বসে বসে। বাদল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিলো। দেখলো অনেকের সঙ্গে ওকেও চীনারা ধরে নিয়ে গেছে। তারপর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারছে সবাইকে। মারার ধরনটা অদ্ভুত। একটি খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধছে প্রথমে উল্টো করে। তারপর পিছন থেকে একজন রাইফেল নিয়ে মুখে জোরে জোরে দশ, নয়, আট, সাত এমনি করে শূন্য পর্যন্ত গুণে গুলি করছে। বাদলের বেলায়ও তাই! পিছন থেকে শব্দ আসছে দশ, নয়, আট....তিন, দুই, এক শূন্য বলার আগেই ধড়মড়িয়ে উঠল ও। ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু চমকে লাফিয়ে ওঠার সময় মায়ের হাতের উলের কাঁটা ওর গলায় ফুটে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল হার্টফেল করে!

হিমাংশু গল্প থামিয়ে বললো—'বাদলকে আমি চিনতাম'। আমার কিন্তু ঘটনাটা সত্যি মনে হয়নি। তোমার কি মনে হয়?

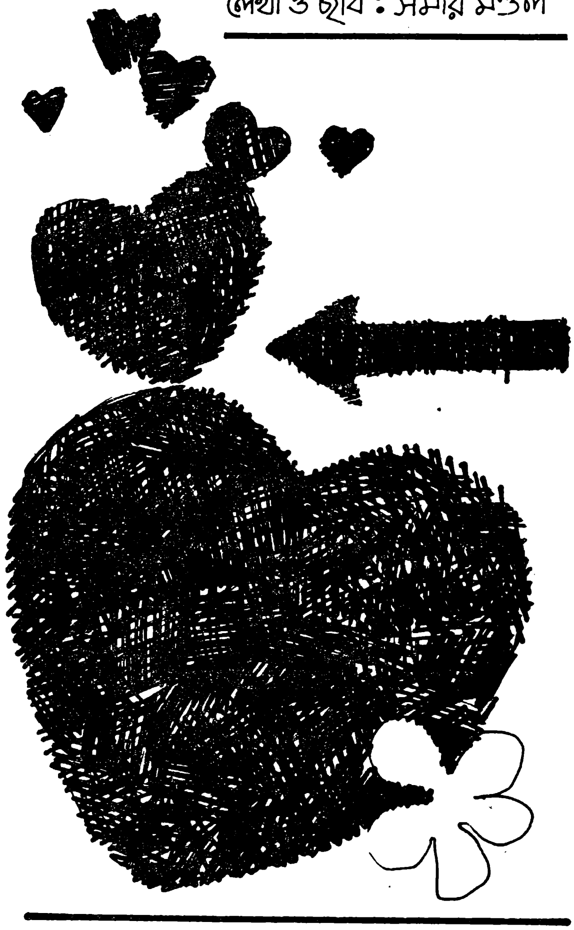

বুদ্ধিশুদ্ধি : ট্রেন টাইমের সমাধান

মামাবাড়ি যাওয়ার ট্রেন আসে সকাল পাঁচটা, ছ'টা, সাতটা, আটটায় এইভাবে সারাদিন। মাসির বাড়ি যাওয়ার ট্রেন আসে পাঁচটা দু মিনিটে, ছ'টা দু মিনিটে, সাতটা দু মিনিটে এইভাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ মামা বাড়ির ট্রেন চলে যাওয়ার দু মিনিটের মধ্যে না পৌঁছালে মাসির বাড়ির ট্রেন ধরা যাবে না।

কম খরচে 10 Watt
স্টিরিও অ্যামপ্লিফায়ার / শুভাশিস্ বিশ্বাস্

আমরা সাধারণতঃ যারা মডেল সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরী করেছি ও করছি, তাদের কাছে কিন্তু ভালো Stereo Amplifier (10watt) মডেলের 'মূল্য' অনেক—অনেক বেশি তাইনা ? আমার খুদে বৈজ্ঞানিকগন তোমারাই বলো এর চাহিদা সত্যিই বেশী কিনা ? সত্যিই এর চাহিদা প্রচুর।

যার জন্য তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমার এই সার্কিট (Amplifier) তৈরীর অবতারণা, যারা কিনা এই মডেল/ Amplifier তৈরী করতে উৎসাহী। তৈরী করা ভীষন-সহজ কিন্তু ! একবার কাজে লেগে পড় দেখবে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। Tape Recorder বা Casset ডেক্ থেকে বেরিয়ে আসা মধুর সঙ্গীতকে আরো বেশী মিষ্টি ; পরিস্কার, ও গমগমে আওয়াজে বাজানো যাবে, খরচটা কিন্তু খুব বেশী নয়।

তাহলে এখন সার্কিট দেখে দেখে তৈরী করা শুরু করে দাও ! দেখো জেনো, পাটস সংযোগ-এর কোন ভুল ভ্রান্তি না ঘটে।

4. Resistance. 4·7K—2Pc
   33OK—1 " 1Ω— 1 "
   100K, V/c, LOG 100K Tone L1N,
5. POWER→ DIOD—1N4001—2P.
   Con—1000nf/25
   Stepdwon Transformer
   12—O—12—600MA.
6. Loud Speaker 8", 1000alt
   4Ω/8Ω
7. P. C. B,/1C BOPD, Solder,
   Wire, Squru, Chasis,
   Jack, Soker—E. T. C.

বিঃ দ্রঃ "IC ঝালাইয়ের সময় যেন IC বেশী গরম না হয়।"

সার্কিট+6V→16V, এ চলবে তবে+12V. দেবে তোমরা IC-তে HEAT SINK ব্যবহার করবে। U.P. এ 10W, 8" 8Ω/4Ω L. S ব্যবহার করবে। তৈরী হলে সেট্‌টি একটা সুন্দর Cabinet-এ সেট্ করে নিও, তাহলে

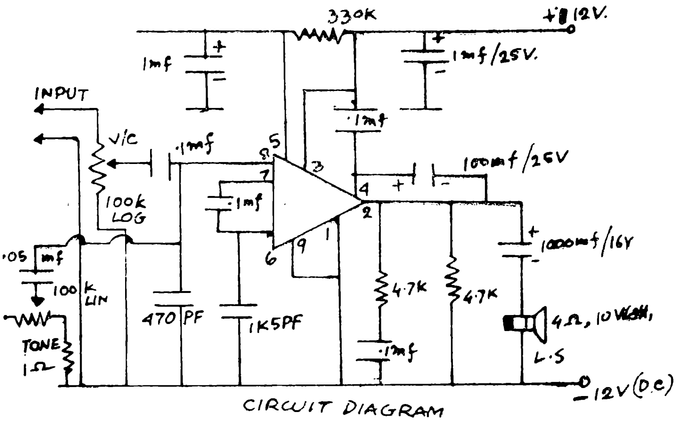

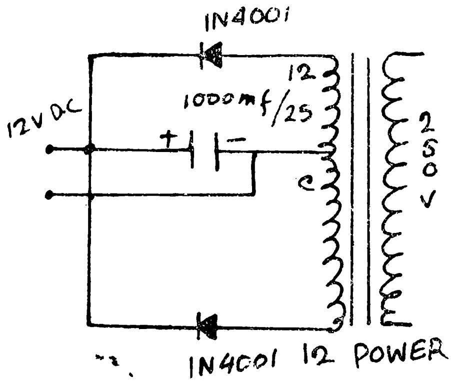

CIRCUIT DIAGRAM

Component List of Amplifier.

1. 1C 1070+Heat Sink
2. Condenscr. 1000/16V.—1Pc,
   100 mf/25V.—1Pc. ·1mf—4Pc.
   ·05mf—1Pc.
3. 470PF, 1K5PF,

দেখতে সুন্দর লাগবে। অথবা Ampli Box-এর ক্যাবিনেটে সেট করবে। ব্যাস্, কাজই এখানে শেষ। এবারে Casset Deck-এ একটা গান চালিয়ে দাও। অসুবিধা হলে এই ঠিকানায় লিখবে,

বেগুলা কলেজ পাড়া
পোষ্ট : বেগুলা, নদীয়া, পিন—741202

বলতে পারো কেন?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের প্রশ্ন
"ঠাণ্ডা লাগার কারণ কী"-এর উত্তর

অনেক সময় দেখা যায়—জলে ভিজলে, বর্ষায় ঘুরে বেড়ালে অথবা স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় অধিকক্ষণ থাকলে দু-একদিনের ভেতরেই শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন জ্বর জ্বর ভাব, হাঁচি, কাশি, সর্দি, ইত্যাদি। এইসব উপসর্গকে চলতি কথায় আমরা ঠাণ্ডা লাগা বলি।

ঐ ঠাণ্ডা লাগার কারণ অনভ্যস্ত পরিবেশে শরীরের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দুর্বল হওয়ার কারণ ভিজে পরিবেশে থাকা। দুর্বল শরীরে এক জাতীয় ভাইরাস দেহে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ পায়। আর ঐ ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলেই সর্দি কাশি হয়। অনেকে ইনফ্লুয়েঞ্জাও বলেন।

প্রসঙ্গক্রমে তোমাদের জানাই যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরাময়ের কোন ওষুধ নেই। ওর দ্বারা আক্রান্ত হলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া বা বাজারের চলতি ওষুধগুলোকে চিবিয়ে খাওয়া আদৌ ঠিক নয়। ওটি কয়েকদিনের মধ্যে আপনিই সেরে যায় এবং শরীরটাও প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। চিকিৎসকদের মতে প্রায় চল্লিশ রকমের ভাইরাস আছে ইনফ্লুয়েঞ্জার এবং প্রত্যেকের আক্রমণে ভিন্ন ভিন্ন রকমের উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই রোগ মারাত্মক নয়। বরং আজে-বাজে ওষুধ এবং কাশির সিরাপ খেলে শরীরের নানা ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা ঐ সব ওষুধ ও সিরাপের অধিকাংশই নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকায় পড়ে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন ঃ
চাল থেকে মুড়ি কি ধরনের পরিবর্তন ?

জানতে চেয়েছে—শ্রীকান্ত প্রধান, দক্ষিণ কাশিনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাথর-প্রতিমা—চব্বিশ-পরগণা।

প্রঃ ডিপথেরিয়ার জীবাণুর নাম কী? কে আবিষ্কার করেন? এর প্রতিষেধক কী? মোহিত সাহা, বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়।

উঃ ডিপথেরিয়ার জীবাণুর নাম ক্লেবস লোপার (clebs Lopper) ব্যাসিলাস। এর আবিষ্কারক লোফলার নামে একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। আবিষ্কার করেন 1884 খ্রিষ্টাব্দে।

সাংঘাতিক ও অতি বিপজ্জনক রোগ। বিশেষ করে ছোটদেরই এই রোগ বেশী আক্রমণ করে। এর বাহক বেড়াল। বর্তমানে এর সিরাম আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া প্রতিষেধক টিকাও শিশুকালে দেওয়া হয়ে থাকে। [বাচ্চার 3 মাস বয়সে ডি.পি.টি. বা ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও ধনুস্টংকারের প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে হয়। 4র্থ ও 5ম মাসে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দেওয়ার নিয়ম। পরের দিকে বুস্টার ইনজেকশনগুলো দশ-বার বছর পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয় এবং এই বিষয়ে যে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।]

প্রঃ রক্তের Rh ফ্যাক্টর কী। অমিত ও ত্রিদীব, সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ—শিবপুর—হাওড়া।

উঃ রক্তের একটি অ্যান্টিজেন। ওদের প্লাজমাতে কোন অ্যান্টিবডি থাকে না। এটির প্রথম সন্ধান লাভ করেন ল্যাণ্ডস্টিনার ও ওয়াইনার নামক দুজন বিজ্ঞানী। 1940 খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে বানরদের নিয়ে গবেষণা চালাবার সময় "রীসাস মাঙ্কিদের মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁদের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর মানুষের শতকরা 80 ভাগের বেশী লোকের রক্তে Rh ফ্যাক্টর ধনাত্মক। বাকিদের ঋণাত্মক।

Rh ফ্যাক্টর ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক না কেন ক্ষতি তেমন হয় না। তবে বাবা ও মা উভয়ের রক্তের Rh ফ্যাক্টর যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে খুবই খারাপ হয় তাঁদের সন্তানদের ক্ষেত্রে। তেমন বাবা মায়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের জণ্ডিসে আক্রান্ত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিষেধকের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কোন শিশুই বাঁচে না। তবে বাবা ও মায়ের একজনের রক্তের Rh ফ্যাক্টর যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে দোষের হয় না।

প্রঃ টিউমার হয় কেন? দেবাংশু মণ্ডল, কাশীনগর হাইস্কুল—উঃ 24-পরগণা।

উঃ দেহের কোন জায়গাতে কোন কারণে অতিরিক্ত

চামড়ার ঢেলা বার হলে (over-growth) তাকে টিউমার বলে। টিউমার সাধারণতঃ দু-রকমের। (১) সিম্পল এবং (২ ম্যালিগন্যাণ্ট। সিম্পল টিউমারের ক্ষেত্রে শুধু নরম মাংসপিণ্ডই চামড়ার উপর গজায় এবং বিশেষ বাড়ে না। কিন্তু ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার দ্রুত বেড়ে উঠে, পরে যন্ত্রণা হয় ক্যানসারও এক ধরণের টিউমার। চিকিৎসাও তাই সহজসাধ্য নয়। উক্ত কারণে যে কোন জায়গায় যে কোন ধরণের টিউমার আত্মপ্রকাশ করলেই ভাল শল্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আদৌ অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রঃ নিউরন কি বিভাজিত হয়? বীরেন্দ্রনাথ মাইতি, বৃন্দাবন চক, মেদিনীপুর।

উঃ না, সক্রিয় সেণ্ট্রোসোম না থাকার জন্য নিউরন বিভাজিত হয় না। তাই শিশু ও বয়স্ক সবার ক্ষেত্রে নিউরন একই থাকে।

প্রঃ সম্মোহন বিদ্যা কি? সজল দলপতি, আন্দুল-মৌড়ি—হাওড়া।

উঃ সম্মোহনবিদ্যা বা হিপনোটিজমকে এক ধরণের কলাবিদ্যা বলা যেতে পারে। এটি খুব প্রাচীন বিদ্যা। আগে এটি যাদুবিদ্যা বা অলৌকিক ঘটনা নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ওকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানবার চেষ্টা হচ্ছে।

আধুনিক সম্মোহন বিদ্যাকে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন ভিয়েনা শহরের এক ডাক্তার ফ্রন্ডস অ্যান্টন মেজমার (1733 খ্রীঃ থেকে 1815 খ্রীঃ) ডাঃ মেজমারের নাম অনুসারে বহুকাল ধরে ঐ বিদ্যাটাকে "মেজমারইজম" বলা হতো। 1840 খ্রীষ্টাব্দে জেমস ব্রেড নামে একজন চিকিৎসক হিপনোটিজম নামটি প্রবর্তন করেন। শব্দটি গ্রীক "হুপ্নস" থেকে নেওয়া—যার অর্থ হচ্ছে ঘুম। অপরদিকে হুপ্নস হচ্ছেন গ্রীক "ঘুমের দেবতার" নাম।

কাউকে সম্মোহিত করতে হলে সম্মোহনকারীকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। ইচ্ছা না থাকলে কাউকে সম্মোহিত করা যায় না। তাই ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্মোহনকারীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। সাধারণতঃ ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্মোহনকারী একটি অন্ধকার ঘরে বসিয়ে রাখেন এবং খুব মৃদুস্বরে তাঁকে বারবার শরীরটাকে বেশ শিথিল করে আরামে বসার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর কোন একটা জিনিসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বলেন। দীর্ঘক্ষণ এইভাবে বসে থাকার ফলে এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ফলে ব্যক্তিটির চোখ দুটো একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সম্মোহনকারী চোখ বন্ধ করতে বলেন এবং নানা নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ফলে এক আচ্ছন্নভাবের সৃষ্টি হয়। তখন তার এমন এক মনোভাবের সৃষ্টি হয় যে, সে নিজেকে অন্ধ কিংবা বোবা ইত্যাদিও ভেবে নিতে পারে। অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। সম্মোহনকারী অনুরূপ অবস্থায় এমন সব কাজ করিয়ে নেন—যা মানুষ সুস্থ-মস্তিষ্কে কখনও করতে পারে না। আর সম্মোহিত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর সে পূর্বে যা করেছে তা মনেও করতে পারে না।

কোন কোন চিকিৎসক উক্ত বিদ্যা রপ্ত করে মানুষের রোগ চিকিৎসার কাজেও প্রয়োগ করতেন এবং এখনও কেউ কেউ করেন। ইংলণ্ডের জনৈক্য চিকিৎসক ডাঃ এস. ডেল অ্যানেস্থেসিয়ার পরিবর্তে সম্মোহিত করে রোগীর দাঁত তুলতেন। এমনকি অনুরূপ উপায়ে ফুসফুসের উপর অস্ত্রোপচার করে সফল হয়েছিলেন।

বর্তমানে কারও মনের চাপ বা দুশ্চিন্তাকে দূর করতে চিকিৎসকদের কেউ কেউ হিপ্নোটিজম করে থাকেন। এতে ভালফলই পাওয়া যায়।

প্রঃ মায়েরা একই সঙ্গে দুটি একই ধরণের সন্তানের জন্ম দেয় কেন? তন্দ্রানী নন্দী, বর্ধমান।

উঃ নিশ্চয়ই যমজ সন্তানের কথা জানতে চেয়েছো। যমজের জন্ম হয় দু-ভাবে। মায়ের ডিম্বক শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসার অব্যবহিত পরে সেটি বিভাজিত হয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে এবং প্রত্যেক বিভাগ বিভাজিত হতে হতে বড় হতে থাকলে যমজ সন্তান হয়। এই যমজ সমকোষী বা সমদর্শী যমজ। অর্থাৎ দুটিই এক ধরণের দেখতে হয় এবং দুটিই হয় কন্যা সন্তান অথবা পুত্র সন্তান।

অন্য আর এক উপায়েও মায়ের গর্ভে যমজ স্থান পায়। যদি মায়ের দুটি ডিম্বক দুটি পৃথক পৃথক শুক্রকীটের দ্বারা নিষিক্ত হয়। এক্ষেত্রে দুজনে একই ধরণের চেহারার হয়না বা দুটির একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তানও হতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে পিতা ও মাতার যৌন ক্রোমোজোম। সুস্থ স্ত্রীলোকের যৌন ক্রোমোজোম জোড়া XX দিয়ে সূচিত করা হয় এবং পুরুষের XY দিয়ে। মাতৃগর্ভে আদি কোষটির যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটি যদি মায়ের X ও পিতার X দ্বারা গঠিত হয় তাহলে হয় কন্যা সন্তান এবং মায়ের X ও পিতার Y দ্বারা যদি গঠিত হয় তাহলে হবে পুত্র সন্তান। সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে এমনটি সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে একটি XX এবং অপরটি XY ক্রোমোজোম দিয়ে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রঃ বাঁকুড়া থেকে শেখ আকবর আলি জানতে চেয়েছেন মঙ্গলগ্রহ এবং তার উপগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এবং পাইয়োনিয়ার-10 এখনও কর্মরত কিনা?

উঃ আপনার প্রশ্ন মার্চ সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন বিমান বসু। পাইয়োনিয়ার-10 এখনও কাজ করে চলেছে এবং সুদূরের গ্রহগুলি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে চলেছে।

প্রঃ বনমানুষ থেকে যদি মানুষের সৃষ্টি তাহলে বর্তমানে কোন একটি বনমানুষ থেকে কেন মানুষের জন্ম হচ্ছে না? সোমা প্রামাণিক, জবদা—মেদিনীপুর।

উঃ প্রশ্নটিতে কোন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে কিনা জানিনা। হয়ত এই কারণে মনে আসছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ প্রকাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠেছিল বিতর্কের তুমুল ঝড়। মাত্র দু-একজন সমর্থক ছাড়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজ প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। সমর্থকদের একজন ছিলেন তৎকালীন ইংলণ্ডের এক মহান বিজ্ঞানী টমাস হেনরি হাক্সলে। এঁকে সবাই ঠাট্টা করে বলতেন ডারউইনের বুলডগ। একদিন এক বিরাট জনসভায় ডারউইনের মতের বিরোধিতার অবতীর্ণ হন সে সময় ইংলণ্ডের সর্বাধিক জনপ্রিয় পণ্ডিত, গণিতজ্ঞ ও অসাধারণ বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক স্যামুয়েল উইলবার ফোর্স। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন হাক্সলে। উইলবার ফোর্স তাঁকেই আক্রমণ করে বললেন আজকাল কেউ কেউ বলছেন, মানুষের পূর্বপুরুষ বানর। আমি মহাপণ্ডিত হাক্সলেকে জিজ্ঞাসা করি তাঁর ঠাকুর্দা কিংবা ঠাকুমা কোন তরফে বানর ছিল?"

সভায় প্রচণ্ড হাস্যরোল ওঠা সত্ত্বেও হাক্সলে আদৌ বিচলিত হন নি। অতি শান্তস্বরে তিনি যা বলেছিলেন তা সংক্ষেপে হলো "একদিকে এক হতভাগ্য বনমানুষ আর অপরদিকে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন এক মহাপণ্ডিত—যিনি হাততালি লাভের আশায় এবং জনমানসকে প্রভাবিত করতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যেও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের আমদানি করেন। আমার যদি নির্বাচন করার সুযোগ থাকতো তাহলে নির্দ্বিধায় পিতামহ রূপে ঐ হতভাগ্য বন-মানুষটাকে বরণ করে নিতাম।"

পাঠকরা যাতে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেন তার জন্যই উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করলাম মাত্র। এবার ডারউইনেরই কথায় আসা যাক। তাঁর মতে জীবন ধারণের তাগিদে এবং অস্তিত্বের সংগ্রামে জীবের রূপান্তর তথা বিবর্তন ঘটেছে। যার জন্য মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীতে ঘটেছে রূপান্তর। জীব যে পরিবেশে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে, তার দেহ গঠন রূপায়িত হয়েছে ঠিক সেই ভাবে। মানুষ নামক জীবটি এমন একটি জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে—যার অন্যান্য শাখায় এসেছে শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বানর ইত্যাদি।

ল্যামার্কের কথায় জীব যে অঞ্চলে বাস করে; সেখানকার আবহাওয়া, খাদ্যসংগ্রহ এবং শত্রুভাবাপন্ন প্রাণীর প্রভাব তার দেহগঠনের উপর পড়ে। তাই সজ্ঞান প্রচেষ্টায় আসে পরিবর্তন। যদিও সে পরিবর্তন অতীব ক্ষীণ এবং বংশানুক্রমিক প্রচেষ্টা সম্মিলিতভাবে জীবদেহে পরিবর্তন এনে দেয়।

অপরপক্ষে বনমানুষ থেকে সরাসরি মানুষ জন্মাতে পারে না। এখানে রয়েছে প্রজাতিগত তফাৎ। স্বাভাবিক পরিবেশে ভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে যেমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না, তেমনই একই প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মিলনে কেবল সেই প্রজাতির সন্তান জন্মায়। অনেকে হয়ত বলতে পারেন, বাঘ ও সিংহ উভয়ের মিলনে যে "টাইগন" জন্মাচ্ছে তার বেলা? এক্ষেত্রে বলি, এটি চিড়িয়াখানাতেই সম্ভব হয় নানা জীববিজ্ঞান সম্মত ওষুধপত্র প্রয়োগের ফলে। প্রজাতির মধ্যে যে জীন ফ্যাক্টর রয়েছে তাকে পাল্টে দেওয়া হয়।

প্রজাতির মধ্যে অবশ্য রূপান্তর আসে অতি ধীর ও মন্থর গতিতে। তার জন্য লেগে যায় লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছর। যেমন ঘোড়ার রূপান্তর হতে সময় লেগেছে প্রায় 6 কোটি বছর। আর রূপান্তরটা আসে পরিবেশের পরিবর্তন হতে থাকলে।

জেনে রাখা ভাল

রাহু ও কেতুর কি অস্তিত্ব আছে?

রাহু ও কেতু বলে কিছুই নেই। জ্যোতিষীদের মতে দুটি গ্রহ এবং তাঁদের গণনা অনুযায়ী অনেকে রাহুর দশা শুনলে আঁৎকে উঠেন।

আসলে রাহু ও কেতু পুরো কাল্পনিক বস্তু। প্রাচীন ভারত জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা নির্ণয় করেছিলেন, চন্দ্রের কক্ষতল ও পৃথিবীর কক্ষতল এক সমতলে নেই। উভয় কক্ষতলকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করলে যে দুটি বৃত্ত পাওয়া যায় সে দুটির মধ্যে 5° কোণ রচনা করেছে। যার জন্য চন্দ্রতলের একটি পৃথিবীর কক্ষতলের উপরের দিকে এবং অপরটি নিচের দিকে। পৃথিবীর কক্ষতলের উপর চন্দ্রকক্ষ যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে তাদের উপরের বিন্দুটির নাম রাহু এবং নিচের বিন্দুটির নাম কেতু দেওয়া হয়েছিল। তারা আরও নির্ণয় করেছিলেন চন্দ্র কেবল রাহু বা কেতু বিন্দুতে এলে সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে এক সরলরেখায় আসতে পারে এবং তখনই গ্রহণ হয়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিন্দু দুটির নাম অ্যাসেণ্ডিং নোড এবং ডিসেণ্ডিং নোড।

পুরাণকাররা এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অসুরে রূপান্তরিত করেছেন এবং গল্প ফেঁদেছেন। আর আমরা আজও সেই গালগল্পে আস্থা রেখেছি—আশ্চর্য নয় কী?

পোঃ—কালিন্দী, মেদিনীপুর।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

আয়োজিত

এপ্রিল '88 থেকে মার্চ '89 পর্যন্ত ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল জুন '88 থেকে মে '89 পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ও সুপার আই কিউ টেস্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে ডিসেম্বর '88 সংখ্যায়।

গত এক বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের কাছে পুরস্কার ও উপহারের কুপন পাঠানো শুরু হয়েছে। 20 মে '89 পর থেকে কুপনসহ পুরস্কার প্রাপকদের অনুরোধ করা হচ্ছে দপ্তর থেকে উপহার ও পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য।

20 মে'র মধ্যে কুপনসহ চিঠি যদি না পৌঁছয় তাহলে দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের গত জানুয়ারি '88 থেকে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা পাঠানো শুরু হয়েছে।

এবার থেকে প্রতি মাসেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের নিয়মিত উপহার ও পুরস্কারের কুপন বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং প্রাপকদেরদপ্তর থেকে পুরস্কার ও উপহার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। 10 জুন এর মধ্যে যোগাযোগ না করলে প্রাপক- দের সাধারণ ডাকে পুরস্কার ও উপহার পাঠানো হবে। যারা রেজিস্টার্ড পোস্টে পেতে ইচ্ছুক তাদের আলাদা ডাক ব্যয় পাঠাতে হবে।

পরিচালক ঃ
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

মার্চ '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **মিঠু ঘোষ**, গ্রাম—মাখালিয়া, পোস্ট—বাখরা হাট, জেলা—দঃ 24-পরগণা-743 377।
2. **দেবরাজ দত্ত**, প্রযত্নে, দীপক দত্ত, বি,বি.—48/4 সেক্টর-I সল্টলেক সিটি কলকাতা-700 064।
3. **কাকলি কর্মকার**, প্রযত্নে দিলীপ কর্মকার, হরিণঘাটা ফার্ম, পোস্ট—মোহনপুর, জেলা—নদীয়া।
4. **দীপসুন্দর সাহ**, গ্রাম—অলংকার পুর, পোস্ট—অলংকার পুর, জেলা—মেদিনীপুর-721 441।
5. **শুভাশিস মণ্ডল**, প্রযত্নে, হরিকাশী মণ্ডল, ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া বড়জোড়া শাখা, পোস্ট—বড়জোড়া, জেলা—বাঁকুড়া-722 202।
6. **কল্যাণেশ্বর মণ্ডল**, প্রযত্নে, ধরাধর মণ্ডল, গ্রাম—গোপাল নগর, পোস্ট—চণ্ডীদাস নানুর, জেলা—বীরভূম।
7. **শুভাশিস বিশ্বাস**, বগুলা কলেজপাড়া, পোস্ট—বগুলা, জেলা—নদীয়া পিন—741 502।
8. **রতন লাল সামুই**. প্রযত্নে, ভানুলাল সামুই, গ্রাম + পোস্ট—রামনগর, জেলা—হাওড়া, পিন—711 312।
9. **সৌমেন চ্যাটার্জী**, 176/4, শিবপুর রোড, হাওড়া—711 102।
10. **এমদাদ হোসেন**, প্রযত্নে, কুতুব-উদ্দিন-মোল্লা, গ্রাম—রামচন্দ্র খালী, পোস্ট—সোনাখালী, জেলা—দঃ 24-পরগণা, পিন—743 312।

মার্চ '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ-কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে ঃ

1. **নবেন্দু সাহা**, 15 B, অধর চন্দ্র দাস লেন, বিধান নগর, কলকাতা-700 067।
2. **তাপস চন্দ্র**, 888, পূর্বাসিঁথি রোড, কলকাতা—700 030।

3. **সন্দীপ ব্যানার্জী**, প্রযত্নে, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী 44, চৌধুরী পাড়া, জেলা—উঃ 24-পরগণা, রহড়া—743 186।

মার্চ '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ-কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : অশোক সাঁধুখা।
বাঁকুড়া : সুপর্ণা রায়, রঞ্জীর বিশ্বাস।

মার্চ '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **কৌশিক বাখণ্ডী**, (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 15/31A, বি.জি. লেন কলকাতা-700 034।

2 **সোনালী পিলাসিমা**, (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 54, গৌরাঙ্গতলা, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

3. **মৌমিতা মণ্ডল**, (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, বিমল মণ্ডল, 49/2, চন্দ্রশেখর মুখার্জী রোড, পোস্ট—খাগড়া, জেলা—মুর্শিদাবাদ।

মার্চ '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : সুমন কুমার দাস।
বর্ধমান : উত্তম কুমার হাজরা।
মেদিনীপুর : তরুণ মল্লিক।

মার্চ '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কার পাবে :

1. **অনিমেষ মণ্ডল**, (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, শৈলেন্দ্র নাথ মণ্ডল, পোস্ট—বালিয়া গোবিন্দপুর, ভায়া—বিড়লাপুর, জেলা—দঃ 24-পরগণা।
2. **রঞ্জিতা সাহা**, (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, জি.ডি. সাহা, উল্টাডাঙ্গা পি. অ্যাণ্ড টি কোয়ার্টার, টাইপ-III, নং-6, কলকাতা-700 067।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন এক একটি প্রতিযোগিতার জন্য আলাদা আলাদা কাগজ ব্যবহার করে। একই কাগজে একাধিক প্রতিযোগিতার উত্তর (যেমন, ক্যুইজ কনটেস্ট এবং আই-কিউ-টেস্ট) একই সঙ্গে লিখলে আমাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। উত্তর পত্রে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা এবং প্রতিযোগিতার কুপনটি থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরিচালক
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

ক্যুইজ কনটেস্ট
গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মে '89 সংখ্যার ক্যুইজ কনস্টের উপহার

গ্রেড-1 **বাংলার গাছপালা**
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রেড-2 **বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ**
সুধাংশু পাত্র

গ্রেড-3 **আরও ফিজিক্স ক্যুইজ**
সমীরকুমার ঘোষ

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.................................

....

বাড়ির ঠিকানা.........................

....

বয়স................. শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেট 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

ট্রানজিস্টার-এর ক্রিয়াপদ্ধতি

অনিরুদ্ধ সরকার

ট্রানজিস্টার। ইলেকট্রনিক্স জগতের একটি বিস্ময়। এই বিস্ময়কর যন্ত্রটি নিয়েই আজ আলোচনা করব।

ডঃ উইলিয়াম শোকলে, ডঃ জন ব্যার্ডেন এবং ডঃ ওয়াটার এইচ ব্রাটেন 'বেল' কোম্পানীতে 1948 লালে ট্রানজিস্টার আবিষ্কার করেন।

প্রথম ট্রানজিস্টারটি, দুইটি সরু প্লাটিনামের তার একটি জারমেনিয়াম ওয়াফারের দুই পার্শ্বে জুড়ে তৈরি করা হয়। এ ধরনের ট্রানজিস্টারকে Point Contact Type Transistor বলা হত। এর কিছুদিন পরেই আরও উন্নত Junction Transistor তৈরি হয়।

আমরা জানি খাঁটি জার্মেনিয়াম বা সিলকনের সাথে ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি বা পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি মিশিয়ে যথাক্রমে P-Type ও N-Type সেমি-কণ্ডাক্টার তৈরি হয়। জাংশন ট্রানজিস্টার দুই প্রকারের তৈরি হয়। একটি P. N. P.-Type আর অপরটি N. P. N. Type। একটি N-Type সেমি-কণ্ডাক্টারের দুই পাশে দুটি P-Type সেমি কণ্ডাক্টার বিশেষভাবে বসিয়ে P N. P.-Type ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে N-Type টি Base ও দুটি P-Type, Emitter এবং Collector হয়। এই সব ট্রানজিস্টারে, এমিটারের তুলনায় বেস কম নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রাপ্ত হয় কিন্তু কালেকটার বেশি নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রাপ্ত হয়। কারণ এখানে কালেকটার বেস জংশনকে রিভার্স বায়াস ও এমিটার বেস জংশনকে ফরওয়ার্ড বায়াস দেওয়া হয়। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে এমিটার ও কালেকটার বেস জংশনের রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে কম ও বেশি হয়।

ঠিক একই ভাবে একটি P-Type সেমি-কণ্ডাক্টারের দুই পাশে দুটি N-Type সেমি কণ্ডাক্টার বসিয়ে N.P.N-Type ট্রানজিস্টার তৈরি হয়। এখানেও P-Type টি বেস, ও দুটি N-Type, Emitter ও Collector হয়। এসব ট্রানজিস্টারে এমিটারের তুলনায় বেস কম পজিটিভ ভোল্টেজ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কালেকটার বেশি পজিটিভ ভোল্টেজ প্রাপ্ত হয়। এখানেও P. N. P.-Type ট্রানজিস্টারের মতন কালেকটার বেস জংশনকে রিভার্স বায়াস ও এমিটার বেস জংশনকে ফরওয়ার্ড বায়াস দেওয়া হয়।

P. N. P. ট্রানজিস্টারে এমিটার বেস জংশনে ও N. P, N. ট্রানজিস্টারে বেস এমিটার জংশনে ফরওয়ার্ড বায়াসকে কমবেশি করে, এমিটার টু কালেকটারে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অর্থাৎ ট্রানজিস্টার গুলিকে সহজেই অ্যামপ্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। নিচের ছবি থেকে এটি সহজেই বোঝা যাবে।

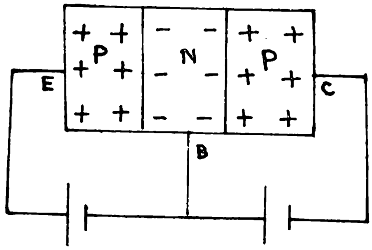

Fig-1. Forward and Reverse Bias of P.N.P Type transistor

1. Common Base Amplifier Circuit,

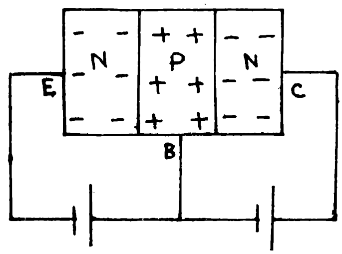

Fig-2. Forward and Reverse Bias of N.P.N Type transistor

2. Common Collector Amplifier Circuit,

এবার আসছি ট্রানজিস্টার অ্যামপ্লিফায়ারে।

প্রধানত তিন প্রকার সার্কিট ট্রানজিস্টার এ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহৃত হয়।

1. কমন বেস অ্যামপ্লিফায়ারে সর্বদা কোন সিগন্যাল এমিটারে প্রয়োগ করলে তা কালেকটার থেকে পাওয়া যায়। এই অ্যামপ্লিফায়ারের গেন মোটামুটি হয়। এই সার্কিটের বেস, ইনপুট ও আউট পুট উভয়ের জন্যই কমন হয়।

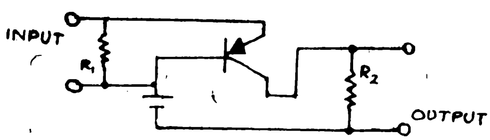

Fig-3. Common Base Amplifier Circuit

3. Common Emitter Amplifier Circuit.

2. কমন কালেকটার অ্যামপ্লিফায়ারে বেসে সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয়। পাওয়া যায় (সিগন্যাল) এমিটার থেকে। এর গেন খুবই কম। তাই ইলেকট্রনিক্স জগতে

এ ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার খুব কম ব্যবহৃত হয়। এর কালেকটার, ইনপুট ও আউটপুট উভয়ের জন্যই কমন। একে ভালভের ক্যাথোড ফলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

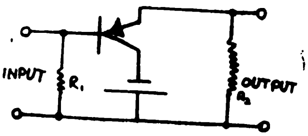

Fig-4. Common Collector Ampiif er Circuit

3. কমন্ এমিটার অ্যামপ্লিফায়ার বহুল প্রচলিত। কারণ এ ধরনের অ্যামপ্লিফায়ারের গেন্ সর্বাপেক্ষা বেশী। বেসে সিগন্যাল প্রয়োগ করলে কালেকটার থেকে বিবর্ধিত আকারে তা পাওয়া যায়। এর ইনপুট ও আউটপুটের জন্য এমিটার কমন।

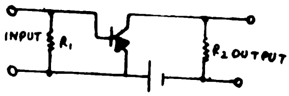

এবার ট্রানজিস্টারের নম্বর নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণত ট্রানজিস্টারে প্রথমে দুটি অক্ষর দিয়ে ও পরে কয়েকটি সংখ্যা দিয়ে নম্বর লেখা হয়।

যেমন AC 128, SF 104, OC 45, 2N3O55 ইত্যাদি। প্রথম অক্ষরের সাহায্যে ট্রানজিস্টারটি কিরকম সেমি কণ্ডাকটার দিয়ে তৈরি হয়েছে বোঝা যায়।

A = Germanium, B = Silicon, O = Semi-Conductor.

২য় অক্ষরের সাহায্যে বোঝাযায় ট্রানজিস্টারটি কোন স্টেজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

A = Diode ; C = A. F. Amplifier ;
D = Power Transistor.
E = Diode Funnel ; F = R. F. Amplifier ;
Y = Power diode or Rectifier ;
Z = Zenner diode ;

শেষে যে সংখ্যাটি থাকে সেটি দ্বারা Transistor-এর ক্ষমতা বোঝায়।

যেমন : Ac 128 এই নম্বর থেকে পাওয়া যায়!
A = Germanium. (প্রথম সংখ্যা)
C = A. F. Amplifier (২য় সংখ্যা)

সুতরাং AC 128 ট্রানজিস্টারটি A. F. Amplifier Circuit ; এটি A. F. Stage-এ ব্যবহৃত হয়। এবং ইহা জারমেনিয়াম সেমি কণ্ডাকটর দিয়ে তৈরি।

আজ এখানেই শেষ করছি। ট্রানজিস্টার ও ইলেকট্রনিক্স সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

অনিরুদ্ধ সরকার। 2, কলেজ ষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(22 পৃষ্ঠার পর)

মতে, কখনো কখনো বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার জন্য প্রচণ্ড শক্তিতে যখন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে শিলাস্তরে আঘাত করতে থাকে, তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। 1882 সালে জাভার ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গালিত লাভা নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ বছরেই জাপানের বন্দইসানে আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও শুরু হয়েছিল।

তিন : শিলাচ্যুতিজনিত কারণ : আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতিকেই (fault) ভূমিকম্পের মূল কারণ বলে মনে করা হয়। 1906 সালের সানফ্রান্সিসকো ভূমিকম্প ও সান আনড্রিয়াস শিলাচ্যুতির কার্যকারণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে অধ্যাপক এইচ এফ রিড ভূমিকম্পের কারণ বিশ্লেষণ করে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপহার দেন। বলতে দ্বিধা নেই, এই তত্ত্ব তাঁর সুদীর্ঘ অনলস চিন্তার ফসল। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত তত্ত্বে (elastic rebound theory) তিনি বলেছেন, শিলাচ্যুতি হওয়ার আগে চ্যুতি-তলের (fault plane) দু'পাশে নানা কারণে ক্রমশ টান পড়তে থাকে। ফলে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচমকা বিচ্যুতি ঘটে। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে দু'পাশের শিলাস্তর।

সাম্প্রতিকালে ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে নতুন একটি তত্ত্বকে মেনে নিচ্ছেন ভূবিজ্ঞানীরা। এটি 'প্লেট টেকটনিকস্' (plate Tectonics) তত্ত্ব। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বহু প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগে প্লেটগুলি একসঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ছিল। পরে এগুলি ভেঙ্গে যায় কতকগুলি প্লেটে। আর পরস্পরের কাছ থেকে সরতে শুরু করে। এভাবে চলতে চলতে একটি প্লেট যখন আর একটি প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখনই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের।

প্রচ্ছদ : সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের আরমেনিয়ার সাম্প্রতিক (ডিসেম্বর 1988) ভূমিকম্পের দৃশ্য। (নভোস্তি প্রেসের সৌজন্যে)।

B4/2 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস, 68/1 বাগমারি রোড, কলি-54
কলকাতা-৬

অমরনাথ রায়

জুনিয়র সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

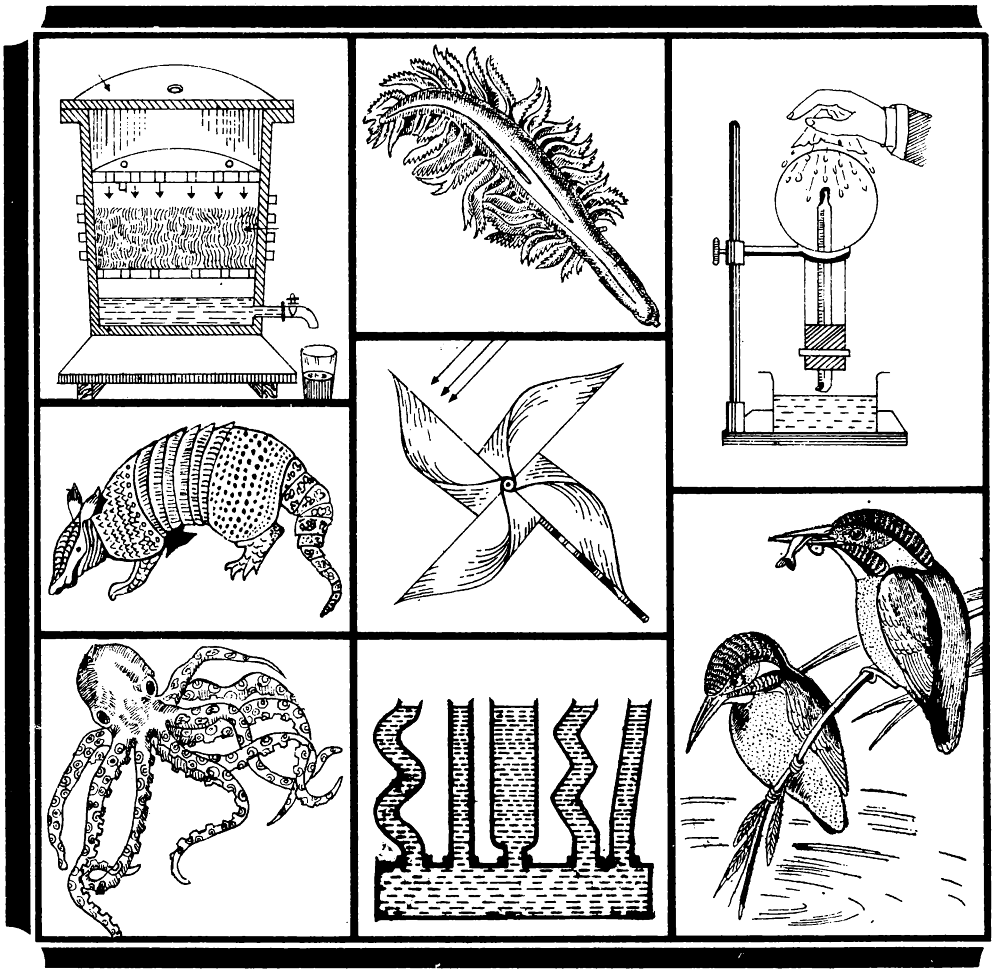

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ।

R/NO 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN Regd. No. WBEC 316 May '89 9th yr VOL 2

জীবন চরিত মালা

জীবনী শতক

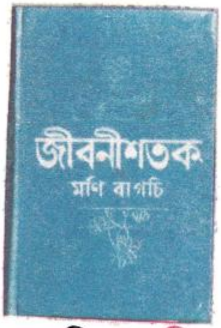

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরেই সপুরিচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে এই জাতীয় সাহিত্যকর্ম করার ফলে জীবনী শতক গ্রন্থের রচনাগুলি ভারসাম্যে মসৃণ ও গ্রহণীয়। গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে মণি বাগচি থেমেছেন মার্কিন লুথার কিং এ। দেশনেতা, সাহিত্যিক বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, শিল্পী অভিনেত্রী সকলেই আছেন। জীবনের বিভিন্ন দিক দিশারী পৃথিবীর একশোজন মানুষের নকশিকৃত অনুপম জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মণি বাগচি। এ রকম একটি গ্রন্থ হাতের কাছে থাকলে প্রায় চরিতাভিধানের মতো সকল প্রকার পাঠকেরই কাজে লাগে। দাম ৩০

মণি বাগচি

অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ কৃতী বিজ্ঞানী মেঘনাদ ॥ মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা ॥ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
আচার্য জগদীশচন্দ্র ॥ যুগদেবতা রামকৃষ্ণ ॥ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

প্রতিটি গ্রন্থের দাম দশ টাকা

নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী

গত দুদশক ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার চাঞ্চল্যকর অগ্রগতির কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, শরীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে সব জটিল রহস্যের কথা আমরা জানতে পেরেছি—তা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু এই রোমাঞ্চকর সকল গবেষকদের সম্পর্কে কতটুকু আমরা জানি। নোবেল জয়ী বিজ্ঞানীদের সেই সব চাঞ্চল্যকর গবেষণা ও জীবন চরিত নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সমরজিৎ করের নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী। দাম ২০

সমরজিৎ কর

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯